ইস্‌লাম গৌরব

শ্রীব্রজসুন্দর রায় প্রণীত

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
কলিকাতা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে
শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১লা মাঘ, ১৩৫০

মূল্য দেড় টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্ম মিশন প্রেস, ২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

FOREWORD

The number of non-Muslim writers on subjects of Islamic interest is not very large in our country : and indeed few of them can be said to have approached the study of Islam in a friendly and appreciative spirit. It is refreshing to find that a learned author like my esteemed friend Babu Braja Sundar Roy, M.A., Principal, Lady Keane Girls' College, has brought out this precious little book which aims at setting forth briefly the special features of Islam which constitute its glory, and has appropriately named the book, "The Glory of Islam". The book offers a refreshing reading and bears the impress of an unbiassed and sympathetic mind.

The book does not appear to be an apology. We live in an age when Islam does not need any apologia —thanks to the efforts of Western and Eastern Scholars of Islam. The mist of ignorance has been dispelled and prejudice has mostly disappeared. The world has not only understood Islam in its right perspective, but has expressed its readiness to accept some of the noble principles on which Islamic faith and Islamic social and political order are based.

Principal Roy's book makes no pretensions of being a scientific research, nor does it claim to make any new contributions to Islamic thought. It is a simple book, simply and elegantly written, and attempts to show where the strength and beauty of Islam actually lay. It sets forth briefly the salient features of the Holy Prophet's life and while on this subject it never omits to show the broadness of his teachings and the catholicity

of his faith. Historical pictures of the Caliphates of Medina and Bagdad, their promotion of arts and letters and their building up of the great Islamic culture and civilisation are also given. I wish the learned author had dealt with the Omayyads of Spain more fully, and had devoted independent chapters to the Omayyads of Damuscus, the Fatimides of Cairo, the Ottoman Turks of Constantinople and the Moghuls of India. In my humble view, no picture of the story of Islam is complete without a survey of the intellectual and cultural achievements of these dynasties.

At places we may not agree with the learned author, but we must bear in mind that the book is from the pen of one who does not belong to the faith of Islam. I am rather surprised to find that the points to which we Muslims may not be inclined to subscribe are indeed so few.

The book is undoubtedly a genuine appreciation of Islam and as such, I am sure, it will be widely read by Muslims and Non-Muslims alike.

I only conclue with the hope that the book, unpretentious as it is, will provoke and encourage an intelligent appreciation of the faith, polity and social order of the Muslims—a thing so sorely needed in these days in India.

Khan Saheb Ataur Rahman, M.A.
A well-known Islamic Scholar
(*Assistant Director of Public Instruction, for Muhammadan Education, Assam*)

Shillong,
June 15, 1940

বাংলা অনুবাদ

আমাদের দেশে ইস্‌লাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে অমুসলমান লেখকের সংখ্যা অধিক নহে ; এবং তন্মধ্যে যাঁহারা বন্ধুতার সহিত এবং আগ্রহান্বিত হইয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা আরো অল্প সংখ্যক। আমার শ্রদ্ধাভাজন বিজ্ঞ বন্ধু, লেডিকিন্ কলেজের অধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর রায় এম্ এ, "ইস্‌লাম গৌরব'' নামক ক্ষুদ্র কিন্তু মূল্যবান্ একখানা গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে একটু নূতন ভাব দেখা যাইতেছে। ইহাতে ইস্‌লামের বিশেষত্বগুলি দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পুস্তিকা-খানি পাঠকালে বেশ একটু আনন্দলাভ হয় এবং গ্রন্থকার যে সহানুভূতি লইয়া সংস্কারমুক্তভাবে সত্য ধরিতে চাহিয়াছেন, তাহা বুঝা যায়।

পুস্তিকাখানি কৈফিয়ৎ দেবার ভাবে লিখিত হয় নাই। আজকাল আর ইস্‌লাম সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজন নাই এবং তজ্জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকে ধন্যবাদ দিতে হয়। এই গ্রন্থে সরলভাবে, সরলভাষায় ইস্‌লামের শক্তি ও সৌন্দর্য্য কোথায় নিহিত, দেখান হইয়াছে। ইহাতে সংক্ষেপে হজরত মহম্মদের জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি বর্ণিত হইয়াছে এবং তাঁহার ধর্ম্মেরও উদার এবং বিশ্বজনীন ভাবসমূহের আভাস দেওয়া হইয়াছে।

ইহাতে মদিনা ও বাগ্‌দাদের খলিফাগণের অনুষ্ঠিত ইসলামের কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্বন্ধে চেষ্টার কিছু কিছু বিবরণ নিবদ্ধ করা হইয়াছে। আমার মতে, গ্রন্থকার যদি স্পেনদেশের শাসনকর্ত্তা অমেয়াদবংশীয় খলিফাগণের সম্বন্ধে আরো বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেন এবং পৃথক পৃথক অধ্যায়ে

ডামাস্কাসের অমেয়াদবংশীয় খলিফাগণের, কেইরোর ফতিমাবংশীয় খলিফাগণের, কনষ্টান্টিনোপলের তুর্কী খলিফাগণের ও ভারতীয় মোগল-বংশের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণনা করিতেন, তাহা হইলে গ্রন্থখানির মূল্য আরো বর্দ্ধিত হইত। এই সমস্ত বংশের রাজন্যবর্গ ইসলামের কৃষ্টি ও জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য যাহা করিয়াছেন তাহা না দেখাইলে ইস্‌লামের ছবিটি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।

স্থানে স্থানে হয়ত গ্রন্থকারের মতের অনুমোদন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে গ্রন্থকার ইস্‌লাম ধর্ম্মের অনুশীলন করেন না। ইহাই বরং বিস্ময়ের বিষয় যে, যে সব কথার আমাদের অনুমোদন করা সম্ভব নহে, তাহাদের সংখ্যা এত অল্প।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে গ্রন্থখানিতে ইস্‌লামের সত্য ঠিক ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং তজ্জন্যই গ্রন্থখানি মুসলমান ও অমুসলমান পাঠকপাঠিকাগণের পক্ষে আদরের সামগ্রী হইবে।

আমার শেষ কথা এই যে, যদিও গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র, তথাপি ইহার পাঠকপাঠিকা ইহা হইতে ইস্‌লামের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন এবং তদ্বারা মুসলমান সমাজের ধর্ম্ম, রাজনীতি ও সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের সত্য বুঝিবার সুবিধা হইবে। বর্ত্তমান সময়ে লোকদের ইহা বুঝার অত্যাবশ্যক প্রয়োজন আছে।

ভূমিকা

যে ইস্‌লাম ধর্ম্ম আরবের মরুভূমিতে জন্মিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে ও এক পঞ্চমাংশ মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার পথ নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহার মহত্ত্ব কোথায় এবং এই ধর্ম্মের অনুশীলন করিয়া মুসলমানগণ কোন কোন বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে পাঠক পাঠিকাগণকে মোটামুটি ভাবে কিঞ্চিৎ বলা আমার উদ্দেশ্য। আমি ইসলামের ইতিহাস লিখিতে বসি নাই, কিন্তু এই ধর্ম্মাবলম্বিগণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র কিরূপে প্রাধান্য লাভ করিলেন এবং কিরূপে তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতির প্রভাব প্রসারিত হইল, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রয়াসী হইলাম। এই ধর্ম্ম মানুষকে পার্থিব জীবনের অনিত্যতা ও পরলোকের নিত্যতা বিষয়ে শিক্ষা দেয়। অতি ক্ষুদ্র মানুষকে জগতের একজন স্রষ্টা ও পালক আছেন, শিক্ষা দিয়া ভগবানের উপর নির্ভরশীল করে ও তাঁহাকে স্মরণ করার কর্ত্তব্যতা শিক্ষা দেয়। এই ধর্ম্ম মানুষের মধ্যে যাহারা দুঃস্থ ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত তাহাদিগকে সাহায্য দান করা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া শিক্ষা দেয়; সমবিশ্বাসিগণের সহিত মিলিত হইয়া ঈশ্বরচরণে কৃতজ্ঞতা ও নতি স্বীকার করিতে চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করে। এই ধর্ম্মের অনুশীলন দ্বারা সমবিশ্বাসিগণের মধ্যে একতা ও মৈত্রী বিশেষভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও সাম্যজ্ঞান বিশেষ বিকাশ লাভ করিয়াছে। দুনিয়ার বাদশা ও ফকির যে ঈশ্বরের নিকট তুল্যমূল্য এবং তাঁহার দরবারে যে ধনী দরিদ্র এক তৌলে তুলিত হইবেন, এই কথা পুনঃ পুনঃ উপদেশ স্বরূপ বলা হয়। কুলের মর্য্যাদা বা পদ-

গৌরব দ্বারা যে পাপ গ্লানি ঢাকিয়া রাখা যাইবে না, এবং অন্তর্দর্শী যে অন্তরের শুদ্ধতা দ্বারা সকলের বিচার করিবেন, সেই সত্যটীও শিক্ষা দেওয়া হয়। অন্তিম বিচারের দিনে কোন প্রকার ছলনা বা চাতুরীতে ফল পাওয়া যাইবে না, তাহাও বিশেষভাবে বলা হয়।

এ কথা সত্য যে, সকল সম্প্রদায়েরই সাধকগণের মধ্যে একেশ্বরে বিশ্বাস স্বীকৃত ও সাধিত হয়। বিশ্বাসই ধর্ম্মের ভিত্তি; ইস্‌লাম এই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া জগতের সকলকে আহ্বান করিতেছে এবং বিশ্বের লোক যে এই আহ্বান শুনিয়াছে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আমরা যদিও ইসলামের পতাকা তুলে দণ্ডায়মান নহি, তথাপি ইসলাম যে ধর্ম্মের মূলতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা স্বীকার করি এবং স্বীকার করি বলিয়াই তদ্বিষয়ক গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করি এবং তদ্বিষয়ে গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। প্রত্যেক ধর্ম্মের কতকগুলি বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান থাকে। সেইগুলি লইয়া লোকেরা সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব করে, কিন্তু সেই সকল আচার অনুষ্ঠান ধর্ম্ম জীবনের মূল সত্য নহে। যাহারা এই সত্য উপলব্ধি করিয়া সাধনে ব্রতী হন, তাঁহারা যে সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত হউন না কেন তাহারা সকলের নমস্য। তাঁহারা সত্যধর্ম্ম কি নিজ জীবনে উপলব্ধি করিতে পারেন এবং ভগবান্‌ও তাঁহাদের নিকট সত্য প্রকাশিত করেন। হজরত মহম্মদ সাধনার দ্বারাই সত্যধর্ম্ম লাভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে ধর্ম্ম প্রচারে প্রেরণা দান করিয়াছিলেন। তিনি যে অন্য প্রেরিত মহাপুরুষগণের ন্যায়ই ধর্ম্মলাভ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি এব্রাহাম, মুসা, ঈশা প্রভৃতি লোকশিক্ষক ও ধর্ম্মাচার্য্যগণের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের নিকট ঋণ অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু তাঁহার নিজের মতের শ্রেষ্ঠতার দাবীও করিয়াছেন। নিরপেক্ষভাবে

বিচার করিলে তাঁহার প্রদর্শিত পন্থার শ্রেষ্ঠতা কোনো কোনো বিষয়ে স্বীকার করিতেই হইবে। তিনি যাহাদিগের নিকটে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন তাহাদিগকে এক ঈশ্বরের পূজা করিতে বলিতেন।

তাহারা চিরাচরিত প্রথা অনুসারে নানা মূর্ত্তি ও নানা দেবতার পূজা করিত ও তাহাদের নৈতিক জীবন নির্ম্মল ও পবিত্র ছিল না। তিনি তাহাদিগকে বিশুদ্ধ জীবন যাপন করিতে উপদেশ দিতেন ও কিরূপে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে হইবে তাহাও শিক্ষা দিতেন। তিনি পরলোকের কথাই অধিক বলিতেন এবং ঈশ্বরের দয়া ও মঙ্গল ইচ্ছা দ্বারা যে জগৎ পরিচালিত, সেই কথাই পুনঃ পুনঃ বলিতেন। তিনি ঈশ্বরে যেরূপ আগ্রহ সহকারে ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতেন, তদ্রূপ বিশ্বাস অতি অল্পসংখ্যক লোকশিক্ষকের মধ্যে দেখা যায়। তাঁহার বিশ্বাস ছিল জ্বলন্ত। আমরা যে ভাবে এই জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, তিনি সেই ভাবেই ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস করিতে। অনেক মুসলমান সাধকদের জীবনে এই বিশ্বাস ঠিক সেই ভাবেই প্রকাশিত হইয়া অলৌকিক রূপ ধারণ করিয়াছিল। "তাপসমালা" নামক গ্রন্থে মুসলমান ভক্তদেয় জীবন চরিত পাঠ করিলে এই কথা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। বিশ্বাসে অসাধ্য সাধন হয়। বিশ্বাসীর জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যাহার কারণ আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি না। হজরত মহম্মদ নিজে উন্মী বা নিরক্ষর ছিলেন বলিয়াই কিংবদন্তী প্রচলিত, কিন্তু তিনি যে সব সত্য শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন তাহার ব্যাখ্যা ও বিচার করিয়াই ইসলাম ধর্ম্মের পণ্ডিতগণ ইসলামীয় শাস্ত্র সমূহ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই জ্ঞানলাভ তাঁহার জীবনে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশের ফল মনে করিতে হইবে। যে আরব জাতি তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, তাহারা তাঁহার ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া পৃথিবীতে অজেয় হইয়া উঠিল। ধর্ম্ম বিশ্বাস যে মানুষকে সকল বিষয়ে মহত্ব দান করে, তাহা

আরবদের ইতিহাস প্রমাণিত করিতেছে। তাহারা নানা রাজ্য ও নানা দেশ জয় করিয়া রাজশক্তির পরিচালনা করিল। বিবিধ তত্ত্ব ও বিজ্ঞান অন্যান্য জাতির নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া জগতের শিক্ষা ও কৃষ্টিকে উন্নত অবস্থায় লইয়া আসিল। সভ্যতা বিস্তার করিয়া জ্ঞানের আলোক প্রজ্বালিত করিয়া এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার অনেক অনুন্নত জাতিদিগকে সভ্যতার উচ্চতর সোপানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল। এই ভারতবর্ষের ধর্ম্মজীবনেও ইস্‌লাম দ্বারা অনেক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা অনেকে এই একেশ্বর বাদ গ্রহণ করিয়া মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই ধর্ম্ম নিতান্ত অধম-জনকেও একটা আত্মগৌরব দান করে। মধ্যযুগীয় অনেক হিন্দুসাধক যে ইস্‌লামের একেশ্বরবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বিশ্বাস লাভ করিয়াছেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। গুরু নানক, দাদু, কবীর, চৈতন্য মহাপ্রভু স্বামী রামদাস, তুকারাম প্রভৃতি সাধকগণ যে ইস্‌লামের শিক্ষা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া গিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বোধ হয় ইস্‌লাম শাস্ত্র পাঠেই এক ঈশ্বরের উপাসনার আবশ্যকতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া, পরে উপনিষদে সেই সত্য লাভ করেন, এবং সুদৃঢ় বিশ্বাসের সহিত তাহা প্রচার ও প্রতিষ্ঠা কল্পে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু সমাজের লোকেরা সকলেই বহু দেবদেবীর পূজা করিলেও ঈশ্বর যে এক একথা সর্ব্বদাই স্বীকার করেন। বাস্তবিক জ্ঞানী মুসলমানগণ ও হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে জেহাদের আবশ্যকতা বোধ করেন না। বিশেষতঃ এই বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার এত প্রচার হইতেছে যে সত্য যাহার জানিবার ইচ্ছা আছে, তাহার পথ সর্ব্বত্র খোলা রহিয়াছে। ধর্ম্মপ্রচার শিক্ষার ভিতর দিয়া হইতেছে। এখন আমরা সকল ধর্ম্মেরই সত্য জানিতে পারি এবং ধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া

কি কর্ত্তব্য তাহা বুঝিতে পারি। আমরা পরস্পরের নিকট হইতে নানা তথ্য শিক্ষা করিতেছি ও জানিতেছি। হিন্দুদেরও এখন ইসলামের ইতিহাস ও মহত্ত্ব উত্তমরূপে বুঝার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বিগণের ও হিন্দুশাস্ত্রে কি সত্য নিহিত আছে, বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পরস্পরকে ভালরূপে বুঝিতে পারিলে, দেখা যাইবে যে মূল সত্য সর্ব্বত্রই এক, কেবল বাহিরের আকার প্রকার ভিন্ন।

ইস্‌লামের নিকট মানব জাতির কি ঋণ আছে, সেই কথাটা কতকটা বুঝাইবার জন্যই "ইস্‌লাম গৌরব" গ্রন্থ লিখিতে প্রয়াসী হইয়াছি। ইতিহাসের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া এই সত্যটা বুঝিয়াছি যে ইস্‌লামের প্রচার দ্বারা জগতের মহদুপকার সাধিত হইয়াছে এবং এখনও যদি ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বিগণ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র থাকেন, তবে তাহাদের দ্বারা জগতের উন্নতিই হইবে। ইস্‌লাম কৃষ্টির পরিপোষক হইলে, মানব-সভ্যতা বৃদ্ধির সহায় হইতে পারে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাহারা যদি হজরত মহম্মদের ন্যায় বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইতে পারেন এবং নিজের জীবন শুদ্ধ করিতে প্রয়াসী হন, তবে অন্য লোকেরা তাহাদের শত্রুতা করিয়া কিছু ক্ষতি করিতে পারিবে না। হজরত মহম্মদ যে ভাবে দরিদ্রতাকে বরণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন এবং যে ভাবে সর্ব্বদা পরের সুখসুবিধা অন্বেষণ করিয়া নিজের জন্য ব্যস্ত হইতেন না, সেইরূপ পরার্থপর জীবন যাপন করিলে কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। ক্ষমতালিপ্সু এবং ভোগপরায়ণ জীবন যাপন করিলে, হজরতের শিষ্যত্ব লাভ হইতে পারে না। কেবল কথায় আমি বিশ্বাসী বলিলে, বিশেষ লাভ হইবে না। কার্য্যে ও জীবনে বিশ্বাস প্রমাণ করিতে হইবে। মুসলমান ধর্ম্মের গৌরব যাঁহারা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের জীবন অনুকরণ করিতে হইবে। তাঁহাদের মহত্ত্ব কোথায় বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। তাঁহারা যে

দরিদ্রতাকে বরণ করিয়াই মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, একথা জানিতে হইবে। যে সব ব্যক্তি জ্ঞানে, কি অন্য বিষয়ে, মহত্ত্বলাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের কার্যপ্রণালী বিচার করিয়া আমাদের জীবন-পথে অগ্রসর হইতে হইবে। বালক বালিকারা যাহাতে সেই মহত্ত্ব কতকটা বুঝিতে পারে তজ্জন্য একটু চেষ্টা করা আমার উদ্দেশ্য।

কলেজে অধ্যাপনার সময় মুসলমান যুবক যুবতীগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি যে তাহারা হজরতের বিষয় বিশেষ কিছু জানে না, এমনকি তাঁহার জন্ম-তারিখও বলিতে পারে না। এইরূপ অজ্ঞতার মূল ধর্ম্মবিশ্বাসে অনাস্থা। মুসলমান ও হিন্দু ছেলে মেয়েরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও বন্ধুভাবাপন্ন হইতে হইলেও পরস্পরের ধর্ম্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে ও কিছু কিছু জ্ঞান থাকিলে ভাল হয়, মনে করি। আমার এই পুস্তিকা পাঠ করিলে ইস্‌লাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু জানা যাইবে এবং কৌতূহলী পাঠক পাঠিকা এই সম্বন্ধে আরো অধিক অধ্যয়নে ব্রতী হইবেন, আশা করি। আমি ইতিহাস হইতে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিলাম। মি. আমীর আলীর গ্রন্থগুলিই আমার প্রধান অবলম্বন দেখা যাইবে। অন্যান্য লেখক-দিগের নিকট হইতেও সাহায্য পাইয়াছি। মি. খোদাবক্সের গ্রন্থ হইতেও কিছু কিছু কথা সংগ্রহ করিয়াছি।

গ্রন্থকার

ইস্‌লাম গৌরব

প্রথম অধ্যায়

হজরত মহম্মদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

হজরত মহম্মদই ইস্‌লামের সর্ব্বপ্রধান গৌরব। জগতের বিশ্বাসিগণের মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চ। তিনি যেভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, তাহা মানব-ইতিহাসে অতি বিরল। তাঁহার বিশ্বাসবলেই আজও মুসলমান সমাজ বলীয়ান্। তিনি যেরূপে নিজের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন এবং যেভাবে আমরাও তাহা করি এবং কোন প্রকার সন্দেহ আমাদের মনে স্থান পায় না, তিনি ঠিক সেইরূপ নিঃসন্দেহে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস কবিতেন। ঈশ্বরের দয়া ও মঙ্গল ইচ্ছা দ্বারাই যে আমাদের জীবনের ব্যবস্থা ও সুখ সুবিধার বিধান হইতেছে, তাহাও তিনি সেইরূপ সন্দেহবিহীনভাবে বিশ্বাস করিতেন। পণ্ডিতলোকেরা যুক্তি ও তর্ক দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন এবং আমাদের অনেকেরই বিশ্বাস যৌক্তিক ও প্রমাণ প্রয়োগে নিষ্পন্ন। হজরতের বিশ্বাস ছিল অন্যরূপ। তিনি আকাশে মেঘগুলি ঝুলিয়া আছে যেমন চোখে দেখিতেন, ঠিক সেইরূপেই ঈশ্বর আছেন ও জগৎযন্ত্র পরিচালিত করিতেছেন, প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বাস করিতেন। ঈশ্বরই জগতের একমাত্র কর্ত্তা

ও প্রভু। আমরা সকলে তাঁহার সৃষ্ট ও ভৃত্য। তিনি আমাদিগকে সব শক্তি ও বুদ্ধি দিয়াছেন, আমরা তাঁহারই কার্য্য করি। তিনিই আমাদের সকলের কর্ত্তা ও স্রষ্টা। তাই মানবজাতি সকলে ভ্রাতা, বিশেষতঃ সমবিশ্বাসিগণ। হজরত মহম্মদ এই শিক্ষাই পুনঃপুনঃ দিয়াছেন। সৃষ্টকর্ত্তাকে ভুলিয়া নানা কল্পিত দেবদেবীর পূজা করা তিনি অন্যায় মনে করিতেন। যিনি ভগবানকে সাক্ষাৎ দেখিতে পান, তিনি মানুষের গড়া দেবদেবীর মূর্ত্তিতে বিশ্বাস করিবেন কিরূপে? যিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া পড়েন, তাঁহার পক্ষে নানা প্রকারের কবি-কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করা সম্ভব নহে। যাঁহার জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় ঈশ্বরের হাত দেখিবার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তিনি ত আর নিজের কর্ত্তৃত্বের অভিমানে স্ফীত হইতে পারেন না। তাঁহার পক্ষে প্রভু পরমেশ্বরের চরণে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণই শান্তির পথ। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ইস্‌লাম শান্তিদায়ক ধর্ম্ম। বাস্তবিক যখন প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র ও সকল ঘটনায় স্বীকার করা যায়, তখন মনে কোনরূপ আক্ষেপ বা খেদ থাকিতে পারে না। কোনো কামনা বা বাসনার পূরণ হইল না, জীবনে অমুক সুখ বা সম্ভোগ আমার হইল না, এবম্-প্রকার খেদ বিশ্বাসী ব্যক্তির হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। বিশ্বাসী ব্যক্তি তাঁহার বিশ্বাসের চক্ষুতে জগৎকে অন্যভাবে দেখেন। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সম্পূর্ণ

পৃথক। আমরা যাহা লাভ বলিয়া গণনা করি, তিনি তাহা লাভ মনে নাও করিতে পারেন। আমরা যাহা ক্ষতি বলিয়া দুঃখিত হই, তিনি তাহাতে আনন্দিত হইতে পারেন। বিশ্বাসী ব্যক্তির ব্যবহার প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে চলে না। তিনি শত্রুকে শত্রুভাবে দেখেন না। তিনি পরাজিত শত্রুকে ক্ষমা করেন ও প্রেম দ্বারা আত্মীয় করিয়া লন। হজরত মহম্মদের জীবনে এই প্রকার অনেক ঘটনা দেখা যায়।

ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হইবার জন্য এই সাধুর জীবন-আখ্যায়িকা আলোচনা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। বাস্তবিক ভগবদ্‌-বিশ্বাসিগণের জীবনচরিতের ন্যায় উপাদেয় উপদেশ আর কি আছে? তাঁহারা কি ভাবে জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান করিয়াছেন, অভাব ও অপ্রাচুর্য্যের মধ্যে তাঁহারা কি ভাবে ধৈর্য্যধারণ করিয়াছেন, জানিতে পারিলে আমরাও বিপদে স্থির থাকিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে পারিব। প্রত্যেক মুসলমান বালক বালিকার কর্ত্তব্য হজরতের জীবনের ঘটনাবলী বিশেষভাবে পাঠ করিয়া স্মৃতিপটে উজ্জ্বল করিয়া রাখা এবং যখনই কোনো সংশয় বা অবিশ্বাস মনকে আন্দোলিত করিবে, তখন তাঁহার বিশ্বাসের অনুরূপ ব্যবহার দ্বারা সেই সংশয়কে দূর করিয়া দেওয়া। আমরা জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত করিব, নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিব, ইহাতে অন্যথা করা উচিত হইবে না, কিন্তু আমরা যদি বিচার করিয়া সত্য বুঝিতে চেষ্টা করি, তবে দেখিতে পাইব যে বিশ্বাস স্বতঃই হৃদয়ে জাগ্রত হয়। জগতের

ঘটনাবলী এবং আমাদের জীবনের ঘটনাপ্রবাহের বিষয় চিন্তা করিলে ঈশ্বর যে আছেন এবং তিনিই তাঁহার অনন্ত শক্তিবলে আমাদিগকে ও জগতের সমুদয় বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হইব। এই বিশ্বাস স্বাভাবিক, ইহা সহজেই মানব-হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। যে ভাবে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইবার পর জগৎ দেখিয়া স্বপ্নদৃষ্ট সমস্ত ব্যাপার ভুলিয়া যাই ও অলীক বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করি, হজরতের নিকট সর্ব্বপ্রকারের সন্দেহ এই ভাবে মিথ্যা ও অর্থশূন্য মনে হইত।

তাঁহার জীবন-কাহিনীর সন্তোষজনক বিবরণ লিখিয়া উঠা আমার পক্ষে কঠিন। নিজে বিশ্বাসী না হইলে বিশ্বাসীর জীবনের ঘটনাবলী সম্যক্ বুঝিতে সমর্থ হওয়া যায় না। অনেক ঘটনা অবিশ্বাসীর চক্ষে অলীক বা কাল্পনিক মনে হইবে। অনেক ঘটনা অর্থশূন্য অতিরঞ্জন মনে হইবে। পক্ষান্তরে তাঁহার অনেক কার্য্যকে অবিশ্বাসী অন্যায় বা ন্যায়বিরোধী মনে করিবেন বা অনেক ঘটনাকে ভ্রান্তিদুষ্ট মনে করিবেন।

তজ্জন্য দেখিতে পাই, তাঁহার জীবনের বহু ঘটনা সম্বন্ধে নানা প্রকার ভিন্ন মত পোষণ করা হইয়া থাকে। কোনো কোনো ঘটনার বিচার করিতে যাইয়া ইউরোপীয় লেখকগণ তাঁহার ভ্রমত্রুটিতে বিরক্ত হইয়া তাঁহার নিন্দা করিয়াছেন। অন্যদিকে তাঁহার মতাবলম্বিগণ সময় সময় অযথা প্রশংসাবাদ লিখিয়াছেন। সামান্য সামান্য ঘটনা লইয়া এই ভাবে বিবাদ করার কোনো অর্থ নাই। তিনি আমাদের ন্যায়ই একজন

মানুষ ছিলেন এবং তৎকালীন অন্যান্য লোকের ন্যায়ই জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। অলৌকিক ঘটনা বলিতে আমরা আজকাল যাহা বুঝি, তাহা তাঁহার জীবনে কিছু কিছু সংঘটিত হইয়া থাকিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস আছে, তথাপি সেই সময়কার লোকেরা হয়ত তাঁহার কার্য্যকলাপে অন্যভাবে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার কার্য্যে নানা অলৌকিকতা আরোপ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এই সব অলৌকিক কার্য্য অপেক্ষা যে সত্যগুলি যুক্তিমূলক, সেইগুলির উপরেই ধর্ম্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বাসের বলে অনেক ঘটনায় মানব-বুদ্ধির সীমা লঙ্ঘন হইয়া যায়। অল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা যখন বহুসংখ্যক শত্রুর পরাজয় তিনি ঘটাইয়াছেন, তখন তাঁহার অনুচরবর্গ ও বন্ধুগণ তাঁহাকে অমানুষিক শক্তির পরিচালক বলিয়া মনে করিয়াছেন। ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। তিনি ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিয়া উপদেশ দিয়াছেন, কাজেই সেই উপদেশে আশ্চর্য্যজনক গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। পাষাণহৃদয় অবিশ্বাসিগণ বিশ্বাসী হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তাঁহার সমবিশ্বাসিগণ যদি সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরের হাত ইহাতে দেখেন, তাহাতে অবিশ্বাস করার ত কোনো অর্থ নাই। যখনই তিনি কোরাণের সুরাগুলি উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহাতে অসাধারণ ভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে। এই ভাবেই ঈশ্বরের দ্বারা বিশ্বাসিগণ অনুপ্রাণিত হন; বিশ্বাসে আশ্চর্য্যজনক ক্ষমতা লাভ হয়। বুদ্ধির

প্রখরতা ও মানসিক উজ্জ্বলতা সম্পাদিত হয়। সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রণয়ন সম্বন্ধেই তজ্জন্য অলৌকিক কাহিনী সমূহ বর্ণনা করা হইয়াছে। বেদকেও সেইভাবে ঈশ্বরের রচনা বলা হয়। ঈশ্বরই তাঁহার ভক্তগণের ভিতর দিয়া তত্ত্ব প্রকাশিত করেন। তিনি আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হন। আমরা কিছুই জানিনা ও বুঝি না। তিনিই জ্ঞানদাতা হইয়া মানুষকে সত্য কি, মিথ্যা কি বুঝাইতেছেন। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিতে তাঁহার বিশেষ প্রকাশ দেখা যায়। হজরত মহম্মদ বিশ্বাসের দ্বারা বিশেষ শক্তি লাভ করিয়া, নূতন সত্য দেখিয়াছিলেন। তাই হজরত অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া যে গ্রন্থ আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন, তাহা ঈশ্বরাদিষ্ট বলিয়াই মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন। হিন্দুরাও গীতাকে ঈশ্বররূপী শ্রীকৃষ্ণের উক্তি বলিয়া বিশ্বাস করেন। বাস্তবিক কোরান বা গীতাতে যে সব আত্মিক ও অলৌকিক সত্য শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং যেভাবে ভাষার ও ভাবের সমাবেশ ইহাতে সাধিত হইয়াছে, ইহাতে তাহাদের প্রশংসা যথোচিতভাবে করিতে হইলেই এই প্রকার গ্রন্থ সমূহকে ভগবদ্ভক্তি বলিতে হয়।

জ্ঞানিগণ অবশ্য বিচার পূর্ব্বক এই সব সত্যের কতটুকু অভিনব এবং কতটুকু পরম্পরাগত নির্দ্ধারণ করেন। অন্য লোকেরা তাহার প্রত্যেকটী কথাতেই নূতনত্ব দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন, এবং প্রত্যেক কথাতেই সত্যতা সমানভাবে স্বীকার করেন। মুসলমান বিশ্বাসিগণ কোরাণের প্রত্যেক

কথাকে ঈশ্বরের বাক্যরূপে গ্রহণ করেন। এইরূপেই এই সব শাস্ত্রের অভ্রান্ততা স্বীকৃত ও গৃহীত হইয়া আসিতেছে। পরবর্ত্তী সময়ের মানুষেরা এই শাস্ত্রের মত সমূহের নানা পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে, কেননা জীবনের অবস্থা সমূহ পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করিয়াছে।

তথাপি তাঁহারা পরিবর্ত্তন স্বীকার করেন নাই, কেননা তাঁহারা মনে করিয়াছেন যে ভগবদ্ভক্তির পরিবর্ত্তন করা ঠিক হইবে না। এই পরিবর্ত্তনকে মূল সত্যের ব্যাখ্যা স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা আমাদিগকে সত্য বুঝাইয়াছেন। প্রকাণ্ড মুসলমান শাস্ত্র এই ভাবে কোরাণের ব্যাখ্যারূপে লিখিত হইয়াছে। ব্যাখ্যাতাগণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়া ভিন্ন ভিন্ন মত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সম্প্রদায় গড়িয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এই সব মতের বিচার আমরা করিব না। এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হইব যে, সত্য প্রত্যেক লোকের নিকট ঠিক এক ভাবে প্রকাশিত হয় না, যদিও আমরা মনে করি যে অন্য সকলে আমাদের মত গ্রহণ করুক ও আমাদের ব্যাখ্যাই খাঁটী সত্য বলিয়া বিশ্বাস করুক, তথাপি, একটু বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে এই জগৎ ও তদ্বিষয়ক তথ্য সমূহ আমাদের প্রত্যেকের নিকট আমাদের ইন্দ্রিয় ও মনের ভিতর দিয়া আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতেছে। আমাদের প্রত্যেকের ইন্দ্রিয় ও মন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সৃষ্ট ও তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জগৎকে গ্রহণ

করিতেছে। আমার নিকট অস্তগামী সূর্য্য যে অন্য লোকের নিকট উদীয়মান সূর্য্য হইতে পারে, আমরা তাহা ভুলিয়া যাই। কাজেই একভাবে আমরা জগতকে জানি না। আমার সত্য অন্যকে জোর করিয়া দেওয়ার কোনো অর্থ থাকে না। যে যতটা পারে সত্য বুঝিবে ও গ্রহণ করিবে, এই ভাবে সত্য সাধনা করিলে বিবাদ বন্ধ হইতে পারে।

প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাসিগণ নিজে যাহা বিশ্বাস করেন, তাহা জগদ্‌বাসীকে বলেন এবং যখন তাহাতে সন্দেহ থাকে না তাহা গ্রহণের জন্য সকলকে আহ্বান করেন এই ভাবেই হজরত মহম্মদ নিজে সত্য কি বুঝিয়া সকলকে সত্যগ্রাহী করার জন্য আকাঙ্ক্ষিত হইয়া থাকিবেন। তিনি বলপূর্ব্বক অন্যকে নিজমত গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণ বিশেষ পাওয়া যায় না। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে যে সত্য নিহিত আছে, তাহা সকল মানুষের মনের কথা। মানুষ যখন সহজ ও সরল ভাবে বিচার করিবে, তখন এই ধর্ম্মের সত্যতা স্বীকার করিবেই করিবে। সুতরাং যখন আরববাসিগণ তাঁহার ধর্ম্মমতের সত্য বুঝিতে পারিল, তখন তাহারা দলে দলে সেই সত্য গ্রহণ করিল। মানুষের হৃদয়ে বিধাতা যে বিশ্বাসের বীজ উপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা অনেক সময় আচার অনুষ্ঠানের আবরণে আচ্ছন্ন থাকে এবং সরলভাবে উদ্ভিন্ন হইয়া মহীরুহে পরিণত হইতে পারে না। বিধাতা সেই বীজের পরিণতির জন্য অবস্থার পরিবর্ত্তন আনয়ন করেন ও লোকশিক্ষকদিগকে প্রেরণ করিয়া

ধর্ম্মের বীজসমূহকে বৃদ্ধিপ্রাপ্তির উপায় করিয়া দেন। যাঁহারা তাঁহার জীবননাশের জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচারে জীবন-মন সমর্পণ করিলেন। এই ধর্ম্মে কতকগুলি এইরূপ নীতি শিক্ষা দেওয়া হয় যে তাহা সকলে গ্রহণ করিতে পারে। যখন কোনো নূতন ধর্ম্মমত প্রচারিত হয়, তখন জীবন শুদ্ধ করার ব্যবস্থা করিতে হয়। আরবদের মধ্যে সেই সময় পানাসক্তি প্রবল ছিল। তাই হজরত মহম্মদ মদ্য পান নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। জুয়াখেলা, মদ্যপান প্রভৃতি পাপ পরস্পরের সহিত অনুস্যূত থাকে। তাই একটী বর্জ্জন করিতে হইলে অন্যটী বর্জ্জন করিতে হয়। সদ্‌গুণগুলিও পরস্পরের সহিত যুক্ত, একটী সদ্‌গুণ দৃঢ়ভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, অন্যগুলি সহজেই লাভ করা যায়। দোষ ত্রুটী সমূহও সেইভাবেই যুক্ত থাকে। মিথ্যাভাষণ, চৌর্য্য, পরদ্রব্যে লোভ প্রভৃতি এক সূত্রে গ্রথিত। কাজেই বিশ্বাসিগণ শুদ্ধতা লাভ করিয়া জীবনে নৈতিক বল লাভ করিলেন। নিজে ঈশ্বরের দয়ার ভিখারী হইলে, অন্য দুঃস্থকে দয়া করিতে হয়। তাই বিশ্বাসিগণ দরিদ্র সমবিশ্বাসিগণের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। আরবেরা তখন দরিদ্রই ছিল, তাই হজরত মহম্মদ নিয়ম করিয়া দিলেন যে সমর্থ ব্যক্তিগণ আয়ের এক নির্দ্দিষ্ট অংশ দরিদ্রগণকে দান করিবেন। এই ভাবে জীবনযাপনকেই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা বলা হয়। আগুন দ্বারা জঞ্জাল ও আবর্জ্জনা যেভাবে দাহ করা যায় ও বায়ু

বিশোধিত হয়, দৃঢ় ধর্ম্মবিশ্বাস ও তৎপ্রসূত নৈতিক বল লাভ করিয়া সেই ভাবে পাপ ও কুঅভ্যাসগুলি দূরীভূত করা যায়। সমাজের নৈতিক আবহাওয়া নূতন হইয়া উঠে। শরীরে ও মনে মানুষ তজ্জন্য নূতন স্বাস্থ্য লাভ করে।

সত্য ধর্ম্মবিশ্বাস হৃদয়ে প্রণোদিত হইলে বুদ্ধির প্রাখর্য্য এবং গভীরতা বৃদ্ধি হয়। যিনি সর্ব্বজ্ঞানের আকর তাঁহার চিন্তনে ও ধ্যানে জ্ঞান গভীরতা ও প্রসারতা লাভ করে। এই নব ধর্ম্মলাভ করাতে আরবগণের মধ্যে একটা নবজীবন সঞ্চারিত হইল। নূতন নীতির পথ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা গৌরবান্বিত বোধ করিলেন। তাঁহাদের জীবনে প্রকৃতই একটা শ্রেষ্ঠতা লাভ হইল। জ্ঞান ও ধর্ম্মেই ত মানবের শ্রেষ্ঠতা। শারীরিক বলে ত অনেক প্রকার পশুপক্ষী মানুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কোনো কোনো ইন্দ্রিয়ের শক্তিতে মানুষ অপেক্ষা পশুপক্ষীর অধিক ক্ষমতা আছে, কিন্তু মানুষ ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞানে অন্য সকল প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ। আরবেরা এই শক্তিতে শক্তিমান হইয়া শ্রেষ্ঠতা লাভ করিলেন।

হজরত মহম্মদকে ইসলামের সর্ব্বপ্রধান গৌরব বলার অর্থ এই যে তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া আরব জাতি মহীয়ান্ হইয়াছেন ও মুসলমান জাতিকে মহীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছেন। মুসলমান সভ্যতার মূলমন্ত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তদনুযায়ী জীবন যাপন। ঈশ্বরে যাঁহাদের বিশ্বাস নাই তাঁহারা মুসলমান বলিয়া গৌরব করিতে পারেন না। জ্বলন্ত

বিশ্বাসই গৌরব দান করে। বিশ্বাস বিহীন গৌরব দাম্ভিকতাতে পরিণত হয়। অহঙ্কারদর্প অভিমান প্রভৃতি দোষ সমূহ অবিশ্বাসের পরিচয় দান করে।

এখন হজরতের জীবনের স্থূল স্থূল ঘটনা সমূহের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা যাইতেছে। আরবদের মধ্যে সম্মানে সর্ব্বোচ্চ কোরিশ বংশে ৫৭০ খৃষ্টাব্দে হজরত জন্মগ্রহণ করেন। ২৯শে আগষ্ট তাঁহার জন্মদিন বলিয়া ধরা হয়। তাঁহার পিতামহ আব্দুল মোতালিবের পুত্রকন্যাগণের মধ্যে চারি পুত্র ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে আবুতালিবই আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা কৃতজ্ঞতার পাত্র। কেননা হজরতের পিতা ও পিতামহের মৃত্যুর পর, তাহার জ্যেষ্ঠতাত আবুতালিব তাহাকে শৈশবে পালন করিয়া মানুষ করিয়া তোলেন। হজরতের পিতা আবদুল্লা ছিলেন তদীয় পিতার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র, এবং আমিনা নাম্নী মহীয়সী রমণীর সহিত বিবাহের পর অল্পকালের মধ্যে পঞ্চবিংশবর্ষ বয়সেই লোকান্তরিত হন।

তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর হজরত ভূমিষ্ঠ হয়েন। এবং পিতৃহীন বলিয়া পিতামহের নিতান্ত আদরের পাত্র হইয়া উঠেন। পিতামহই তাঁহাকে মহম্মদ (প্রশংসিত) নামে অভিহিত করেন। হজরতের ছয় বৎসর বয়সের সময় তাঁহাব মাতা ঠাকুরাণীও স্বর্গারোহণ করেন। আবদুল মোতালিবও ৫৭৯ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন, কিন্তু মৃত্যুর সময় পুত্র আবুতালিবকে

মক্কার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া যান এবং হজরতের শিক্ষাদীক্ষার ভারও তাঁহার হাতে অর্পণ করেন। জ্যেষ্ঠতাত আবুতালিব ভ্রাতুষ্পুত্রকে পুত্রের ন্যায় পালন করিয়া তৎকাল প্রচলিত শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। মহম্মদ বাল্যেই তাঁহার ব্যবহারে সকলকে প্রীতিদান করিতেন। আত্মীয় বন্ধুগণের মধ্যে তাঁহার চরিত্রের খ্যাতি প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রেমার্দ্র হৃদয় দরিদ্রের জন্য পীড়া বোধ করিত। তিনি শ্রমপটু ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল ছিল না। তাই তিনি জ্যেষ্ঠতাতের পুত্রগণের সহিত পালামত পশ্বাদির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। আরবগণের মধ্যে পশুচারণ প্রধান ব্যবসায় ছিল। বাণিজ্য দ্বারাও ধনাগমের পন্থা তাঁহারা অনুসরণ করিতেন। পণ্য সম্ভার উষ্ট্রপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া তাঁহারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইতেন ও বিক্রয় করিয়া লাভবান্ হইতেন। হজরত এইরূপ বাণিজ্যে নিযুক্ত হইলেন। তিনি অন্যান্য আরব স্বার্থবাহীদিগের সহিত সিরিয়া প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যের জন্য যাতায়াত করিতেন। আরব দেশের নানা স্থানে তখন খৃষ্টান ও ইহুদীগণ বাস করিতেন। হজরত বাল্যকাল হইতে চিন্তাশীল ও গম্ভীর প্রকৃতি লোক ছিলেন। তিনি একেশ্বরবাদী ইহুদী ও খৃষ্টানদের ব্যবহারে অসত্য ও বঞ্চকতার পরিচয় পাইতেন এবং তাঁহাদের ধর্ম্মবিষয়ে বিবাদ বিসংবাদ দেখিয়া বিরক্ত হইতেন। ক্রমে ধর্ম্ম বিষয়ে সত্য কি তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না।

তিনি তাহার স্বজাতির ও স্বগোষ্ঠীর ভ্রান্ত ধর্ম্মান্ধতা দেখিতেন, এবং তাহাদের দুর্নীতি লক্ষ্য করিতেন। চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে এই সব বিষয়ে চিন্তা করা ও দুর্নীতির কারণ অবধারণ করা কঠিন নহে। তিনি নিশ্চয় দেখিয়া থাকিবেন যে ইহারা মুখে দেব দেবীর নানা কথা বলে, কিন্তু ঈশ্বরে প্রকৃত বিশ্বাস ইহাদের নাই। তিনি পঞ্চবিংশ বৎসর বয়সে খাদিজা নাম্নী এক বিধবা রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। এই রমণীর মহত্ত্ব আরব ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ইনি ঐহিক ও পারত্রিক সম্পদে সম্পন্না ছিলেন। ইহাকে স্ত্রীরূপে লাভ করিয়া হজরত নিশ্চয়ই সুখী হইয়া থাকিবেন। তাঁহাদের পুত্র ও কন্যাগণের মধ্যে পুত্রেরা সকলেই শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কন্যাগণ তাঁহাদের পিতার গৌরবময় প্রবর্ত্তক, প্রচারক ও সিদ্ধ জীবনের প্রভাব ও পরিণতি দেখিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

সর্ব্বকনিষ্ঠা ফতেমার বিবাহ হইয়াছিল আবুতালিবের পুত্র আলীর সহিত। ইহারা উভয়েই তাঁহাদের বিশ্বাস ও সাধু জীবনের জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। আলীর জীবনের ন্যায় সুন্দর জীবন ইতিহাসে স্বল্পই দৃষ্ট হয়। খৃষ্টধর্ম্মের প্রধান যাজক পিটারও তিনবার নিজগুরু য়িশুকে অস্বীকার করিয়াছিলেন, বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু খাদিজা ও আলী যে ভাবে হজরতের ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া বিশ্বস্তভাবে তাঁহার অনুবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের নিকট ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বিগণ চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন।

বিবাহের পর হজরত পনরো বৎসর সংসার ধর্ম্ম পালন করেন। খাদিজার পাণিগ্রহণের পর তাঁহার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বিধবা ও অসহায় শিশু-দিগকে সাহায্য করার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি লোকের ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করিয়া শত্রুদিগের মধ্যে বন্ধুতা স্থাপন করিয়া দিতেন। তাঁহার পরিচিত লোকেরা সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা তাঁহার ধৈর্য্য ও উদারতা সকলকেই প্রীতি দান করিত। তাহারা তাঁহাকে 'অল আমিন' বা বিশ্বস্ত অর্থাৎ সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিল। তিনি শিশুদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন ও তাহাদের সঙ্গলাভ করিতে ব্যগ্র থাকিতেন। শিশুরাও তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত। ইহাতে তাঁহার হৃদয়ের প্রেম ও পবিত্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। সাধুদের মধ্যে শিশুর ন্যায় একটা সরলতা সর্ব্বত্রই দেখা যায়। যিশুও শিশুদিগকে ভালবাসিতেন। প্রতিবৎসর হজরত একমাসকাল নির্জ্জনে হিরাপর্ব্বতের গুহায় বাস করিতেন এবং ধ্যানে ও ঈশ্বর আরাধনায় কাল যাপন করিতেন। এইরূপ ধ্যানের সময় একদা রাত্রিতে তাঁহার নিকট ভগবান্ প্রকাশিত হইলেন।

তাঁহার প্রতি আদেশ হইল 'যাও জগতে একেশ্বরবাদ প্রচার কর'। তদবধি তিনি প্রচারক জীবন যাপনের দৃঢ় ব্রত গ্রহণ করিলেন। বিশেষ ভাগ্যবান্ লোকদিগের প্রতি

এরূপ কৃপা প্রদর্শিত হয়। তাঁহারা এরূপ আদেশ লাভ করিয়া থাকেন।*

হজরত মহম্মদ এই সুসংবাদ সর্ব্বপ্রথমে স্বীয় পত্নী মহীয়সী খাদিজাকে দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বামীর কথা বিশ্বাস করিয়া পূর্ব্বাভ্যস্ত পৌত্তলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার জামাতা আলী

---

* ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন অষ্টাদশবর্ষ বয়সে এইভাবে "প্রার্থনা কর", "প্রার্থনা কর" আদেশ লাভ করিয়া সমস্ত জীবনকে প্রার্থনাময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। ভক্তিভাজন কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় একদিন স্কুলে পড়াইতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার প্রতি আদেশ হইল, "বাড়ী যাও"। তিনি প্রথম এই কথা গ্রাহ্য করিলেন না। পুনরায় আদেশ হইল, "বাড়ী যাও"। তখন তাঁহার চেতনা হইল এবং তিনি প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে বলিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কিছুদূর যাইয়া দেখিলেন যে, তিনটী সুন্দরী গুণ্ডাগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া চলিয়াছে। তিনি দেখিয়াই তাহার প্রতি হুকুমের অর্থ বুঝিতে পারিলেন। তিনি মেয়েদিগকে তাঁহার মেছ্ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে সঙ্কেত করিলেন। তাহারা তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া মেছে প্রবেশ করিল, তিনি দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া পুলিশে খবর পাঠাইলেন। গুণ্ডারা চলিয়া গেল, কিন্তু পুনরায় তাহারা কয়েকজন নেপালী লোকের সঙ্গে আসিয়া মেয়েদিগকে তাহাদের স্ত্রী বলিয়া ফিরাইয়া দিতে বলিল। মেয়েরা তখন পুলিশের সম্মুখে বলিল যে তাহারা ইহাদের সঙ্গে যাইবে না; ইহারা তাহাদের স্বামী বা অন্য কোন আত্মীয় নহে ইহারা আততায়ী, তাহাদিগকে হত্যা করিবে। তখন গুণ্ডারা হতাশ হইয়া চলিয়া গেল। এই তিনটী মেয়ে নেপালের রাজদরবারে একটা হত্যাকাণ্ডের সময় পলাইয়া কাশীতে আসে ও প্রাণরক্ষার জন্য পরে কলিকাতায় আসিয়া এইভাবে বিপন্ন হয়। এই তিনটীকেই ব্রাহ্মসমাজের তিনজন ভদ্রলোক গ্রহণ করিয়া শিক্ষাদান করেন ও বিবাহ দিয়া দেন। পরে ইহারা তিনজনেই ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট সভ্যশ্রেণীতে পরিচিত হয়েন। বিধাতা এই ভাবেই বিশেষ বিশেষ মহাপুরুষদিগের প্রতি আদেশ দিয়া বিশেষ কার্য্যে ব্রতী করেন। কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় পরে "নারী-রক্ষা সমিতি" স্থাপন করেন। আধুনিক নারী-রক্ষা সমিতিসমূহ তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া ধর্ষিতা ও অত্যাচারিতা নারীগণের রক্ষা বিধান করিতেছেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন আমাদিগকে প্রার্থনা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন; কি ভাবে প্রার্থনা করিতে হয়, তাহার লিখিত গ্রন্থাদিতে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিয়াছেন। যাঁহারা হজরত মহম্মদের প্রচারক-জীবনের ইতিহাস পাঠ করিবেন তাঁহারা দেখিবেন তিনি কি ভাবে এই হুকুম পালন করিয়াছেন।

হইলেন তাঁহার দ্বিতীয় শিষ্য। ক্রমে আবুবেকর, ওমর, হাম্‌জা, এবং ওস্‌মানও তাঁহার মত গ্রহণ করিলেন। "বিশ্বাসে বিশ্বাস জাগায়"। বিশ্বাসী হজরতের কথায় তাঁহাদের হৃদয়ের প্রসুপ্ত বিশ্বাসবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। এক একটা যুগ এই ভাবেই প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু স্বার্থপর ঐহিকতা পরতন্ত্র লোকেরা সহজে বিশ্বাসের কথা শুনিতে চায় না। তাহারা বিশ্বাসীকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে। এই ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। প্রথমে তাহারা বিশ্বাসিগণকে বিদ্রুপ করিত, ক্রমে বিরোধী হইয়া উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। তাহারা হজরত ও তদীয় অনুচরবর্গকে নানাভাবে উপদ্রব দিতে আরম্ভ করিল। এমন কি তাহারা কতিপয় বিশ্বাসী ভক্তের প্রাণ বিনাশ করিতেও ছাড়িল না। এইরূপে বিশ্বাসীদের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। হজরতের শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ পলাইয়া আবিসিনিয়ার খৃষ্টান নরপতির আশ্রয়ে চলিয়া গেলেন। কেহ কেহ সমস্ত অত্যাচার অন্যায় সহ্য করিয়া পয়গম্বরের আশ্রয় পরিত্যাগ করিলেন না। সমস্ত বিপদকে বরণ করিয়া লইয়া তাঁহারা ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন বটে, কিন্তু বিদ্রোহিগণের অত্যাচার ক্রমে অসহনীয় হইয়া উঠিল।

এই সময়ে আবুতালিব ও খাদিজার মৃত্যু হওয়ায়, হজরত অসহায় বোধ করিলেন। শত্রুগণও অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করিল। তিনি অন্য স্থানে ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টার জন্য তায়েফ্ নামক স্থানে চলিয়া গেলেন, কিন্তু তথাকার অধিবাসীরা

তাঁহাকে আমল দিল না। তখন তিনি হতাশ হইয়া স্বীয় নগর মক্কাতে ফিরিয়া আসিলেন এবং যখন তীর্থযাত্রীরা কাবা মন্দির দর্শন করিতে আসিতেন, তাহাদের নিকট স্বীয় নবধর্ম্ম প্রচার করিতেন। ইহাদের কেহ কেহ তাঁহার মত গ্রহণ করিয়া পৌত্তলিক ধর্ম্ম ও দুর্নীতি ত্যাগ করিল। অনেক লোক কাবা মন্দিরে তীর্থ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর, সেই নবধর্ম্মের বার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচার করিতেন; ইহাতে ক্রমে এই সত্যধর্ম্মের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ৬২২ খৃষ্টাব্দে ইথ্রেববাসীরা হজরতকে আমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের নিকটে এই ধর্ম্মের তত্ত্ব প্রচার করার জন্য অনুরোধ করিয়া দূত পাঠাইলেন। এই আহ্বানের খবর পাইয়া কোরিশগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল, কেননা সেই সময় মক্কা ও ইথ্রেব দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বী নগর ছিল। তাহারা হজরতকে বধ করার জন্য চেষ্টা করিতেছিল, কাজেই ইথ্রেববাসী-দিগের সাদর আহ্বানকে তাহারা তাহাদের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার পরিচায়ক মনে করিল এবং পয়গম্বরের শিষ্যগণকে নানাপ্রকারে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। সুতরাং অনেক মুসলমান ইথ্রেবে চলিয়া গেলেন। আবুবেকার ও আলী হজরতের সাহায্যার্থ মক্কায়ই রহিয়া গেলেন। পরে হজরত ও আবুবেকার এক সঙ্গে ইথ্রেবে যাত্রা করিলেন।

দুর্ব্বৃত্তগণ তাঁহাদিগকে পথিমধ্যে নিহত করার জন্য তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবমান হইল। তাঁহারা একগুহায় আশ্রয় লইয়া লুকাইয়া রহিলেন। কোরিশগণ তাঁহাদের কোনো

সন্ধান পাইল না। তাঁহারা যে গুহায় আশ্রয় লইলেন তাহার প্রবেশ পথে এক মাকড়সা জাল তৈয়ার করিয়া প্রবেশ পথ বন্ধ করাতে শত্রুরা তাঁহাদিগকে খোঁজ করিবার সময় মাকড়সার জাল দেখিয়া কেহ প্রবেশ করে নাই সিদ্ধান্ত করিয়া চলিয়া গেল। বিধাতা এইরূপ আশ্চর্য্য কৃপা দেখাইয়া নিজভক্তকে রক্ষা করিলেন। তৃতীয় দিবস সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে তাঁহারা উভয়ে গুহা হইতে বহির্গত হইয়া উষ্ট্র সংগ্রহ করিলেন এবং দ্রুতবেগে উষ্ট্রারোহণে ২রা জুলাই ইথ্রেবে পৌঁছিলেন। পরে আলী মক্কা হইতে পলাইয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে ইথ্রেবে উপস্থিত হইলেন। ৬২২ খৃষ্টাব্দে এই নির্ব্বাসন ব্যাপার সংঘটিত হইল। কাজেই এই বৎসরকে হিজিরা অব্দের প্রথম বৎসর গণনা করা হয়। ইথ্রেববাসিগণ তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের নগরের নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া মদিনা বা "আচার্য্যের নগর" নাম দিলেন। এই নামেই মদিনা আজও পরিচিত হইতেছে। মুসলমানগণ মদিনাতে একটি উপাসনা-গৃহ বা মসজিদ্ নির্ম্মাণ করিলেন। হজরত স্বয়ং এই মসজিদ নির্ম্মাণ কার্য্যে অংশ গ্রহণ করিয়া অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। এই মসজিদে তিনি তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিতেন ও লোকদিগকে নৈতিক জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করিতেন। তিনি মানবের ভ্রাতৃত্ব প্রচার করিতেন, বিশেষতঃ বিশ্বাসিগণের মধ্যে সৌহার্দ্দের প্রয়োজনীয়তা, অসহায় বালকবালিকা ও বিধবাদিগের প্রতি

করুণা ও জীবের প্রতি দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিষয় উপদেশ দিতেন। অন্যের ধর্ম্মমতের প্রতি শ্রদ্ধার কথাও বলিতেন। বলপূর্ব্বক অন্যের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করার অপচেষ্টা তিনি কখনও করেন নাই।

মদিনার অধিবাসিগণের মধ্যে দুইটী দল ছিল এবং ইহাদের মধ্যে বেশ রেষারেষির ভাব ছিল। বহু ইহুদিও তথায় বাস করিত। হজরত এই বিবাদমান সম্প্রদায়গুলি যাহাতে শান্তিতে বাস করিতে পারে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম কালে একটী প্রবল সম্প্রদায় হইয়া উঠিবে, কাজেই তাহাদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে হইবে।

তিনি একটী ঘোষণা-পত্র প্রচার করিলেন এবং ইহাতে সমস্ত মদিনাবাসীকে আন্‌সার বা সাহায্যকারক নামে অভিহিত করিলেন। সকলেই একরূপ নাগরিক অধিকারে অধিকারী হইবেন ; মানুষে মানুষে কোনোরূপ ভেদ বা বৈষম্য থাকিবে না—এইরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিলেন। ইহুদিগণও নাগরিক অধিকারে অধিকারী হইলেন। তাহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে কোনো-রূপ বাধা দান করা হইবে না, এইরূপ প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইল। সেই সময় আরবের সর্ব্বত্রই একটা অরাজকতা চলিতেছিল। বংশে বংশে, নগরে নগরে বিবাদ লাগিয়াই ছিল ; লুট-তরাজও চলিত। বলপ্রয়োগে একে অন্যের ধন প্রাণ হরণ করিতে দ্বিধা করিত না। বেপরওয়াভাবে লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড

সংসাধিত হইত। পরলোকে সাজা পাইতে হইবে—এইরূপ ভয় কাহারো মনে স্থান পাইত না।

বিশ্বাসী হজরত মহম্মদ এই অবিশ্বাস-অসুরকে ধ্বংস করিয়া বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সুতরাং নিয়মকানুন প্রবর্ত্তিত করিয়া যাহাতে আইনসঙ্গত ও নীতিসম্মত জীবন লোকেরা যাপন করিতে পারে, তজ্জন্য তিনি নিজেই শাসকের কার্য্য করিতে বাধ্য হইলেন। কেবল নীতির কথা বলিলে সমাজ রক্ষা হয় না; নীতি ও নিয়ম যাহাতে অনুষ্ঠিত এবং প্রতি-পালিতও হয় তাহাও দেখিতে হইবে। নিয়মলঙ্ঘনকারীকে সময় সময় দণ্ড দিয়া নিয়মপালনে বাধ্য করিতে হইবে। এই ভাবে হজরত আচার্য্যের ও শাসকের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বিশ্বাসিগণের নেতা ও পরিচালক হইয়া উঠিলেন। আমরা আজকাল ধর্ম্মপ্রচারক ও আচার্য্যগণকে মাজিষ্ট্রেটের কাজ করিতে দেই না। বর্ত্তমান সময়ের সমাজ-ব্যবস্থায় এক শ্রেণীর লোক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত হন। অন্য এক শ্রেণীর লোকেরা ধর্ম্মোপদেষ্টার কার্য্যে ব্রতী থাকেন। কিন্তু সেই সময়ে সমাজের ব্যবস্থা অনুন্নত ছিল। অধিকাংশ লোক অজ্ঞ ও অবিশ্বাসী ছিল। তাহারা নানা দেবদেবীর পূজা করিত বটে, কিন্তু নীতিধর্ম্ম কি তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝিত না এবং বুঝিলেও নৈতিক জীবন যাপন কি ভাবে করিতে হইবে জানিত না। সুতরাং হজরত যে কেবল ধর্ম্ম শিক্ষক ও প্রচারক ছিলেন, তাহা নহে। তিনি তাহাদের বিবাদ মীমাংসা

করিতেন। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তাহার উত্তরাধিকারিগণ কি ভাবে ভাগ করিবে বলিয়া দিতেন। ক্রীতদাসদাসীদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, সেই সকল নিয়মও প্রবর্ত্তিত করিলেন। আরবদের মধ্যে মেয়েদের প্রতি দুর্ব্যবহার হইত। এক পুরুষ অনেক স্ত্রী গ্রহণ করিত। কাজেই বিবাহ-বন্ধন কিরূপে ছিন্ন করিতে হইবে, ইত্যাদি বিষয়েও নীতিসঙ্গত নিয়ম প্রতিষ্ঠা করিতে তিনি বাধ্য হইলেন। আমাদের নিকট তৎপ্রণীত কোনো কোনো নিয়ম অযৌক্তিক মনে হইতে পারে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাদীক্ষার দ্বারা উন্নত সমাজে যাহা সম্ভব, তেরশত বৎসর পূর্ব্বের অশিক্ষিত এবং অনুন্নত সমাজে তাহা সম্ভব ও সমীচীন মনে হইতে পারে না। ধীরভাবে চিন্তা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে তিনি প্রবৃত্তির দাস অশিক্ষিত লোকদিগকে সংযমের পথেই লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। মানুষকে কতকটা তাহার প্রবৃত্তির পথে চলিতে দিয়া, তাহাকে নিবৃত্তি বা ত্যাগের পথ দেখাইতে হইবে।

তাই হজরত ব্যবহারিক জীবনের বিধি-ব্যবস্থা দ্বারা ত্যাগ শিক্ষা দিয়াছেন ; যদিও প্রকৃত ত্যাগ বা বৈরাগ্য মানুষের মনে স্বাধীনভাবেই গড়িয়া উঠে এবং সেই বৈরাগ্য মানুষ নিজের চেষ্টায়ই লাভ করে। হজরতের প্রবর্ত্তিত নিয়মকানুন-গুলি অবলম্বন করিয়াই পরবর্ত্তীকালে পণ্ডিতগণ জটিল ইসলামীয় ব্যবস্থাশাস্ত্রসমূহ সংকলন করিয়াছেন। ইহাতে দেখা যায় যে, তাঁহার জ্ঞান কত গভীর ছিল। এই অপৌরুষেয়

জ্ঞান দেখিয়াই তাঁহার প্রণীত শাস্ত্রকে ভগবদ্ বাক্য বলিয়া স্বীকার করা হয়। বাস্তবিক যাঁহার মানব-চরিত্রের জ্ঞান এত গভীর ও ব্যাপক, তাঁহাকে ভগবদাদিষ্ট বলিতে আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না। আমরা আমাদের নিজের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি না। হিত কি, অহিত কি, জানিয়াও হিতকার্য্য করিতে পারি না। তিনি এক-পঞ্চমাংশ মানবের জন্য কি ন্যায্য এবং কি অন্যায় তাহা বলিয়া দিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকে অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ মনে করা স্বাভাবিক। তাঁহাকে মানুষের জীবনযাত্রার সব বিষয়েই চিন্তা করিতে হইয়াছে এবং সব বিষয়েই নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতে হইয়াছে।

আরবেরা পরস্পরের ধন লুণ্ঠন করিত। পয়গম্বরের অনুচরবর্গ যখন আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইলেন, তাঁহারাও শত্রু শিবিরে প্রাপ্ত ধনরত্ন লইয়া আসিতেন। এই লুণ্ঠিত দ্রব্য যাহাতে সকলের মধ্যে ভাগ করা হয় তাহার ব্যবস্থা হজরত করিয়া দিলেন। তিনি নিজে কখনও এই লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ লইতেন না। বিধবা ও পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকাগণ যাহাতে সাহায্য পায় তাহার ব্যবস্থা করিতেন। দরিদ্রগণের জন্য তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকিতেন। এই সব বিবেচনা করিলে. তাঁহাকে মুসলমান সম্প্রদায় যে শ্রদ্ধা দান করেন, তাহা অতিরঞ্জিত মনে করা যায় না।

তিনি মদিনার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সহরবাসিগণ যাঁহাতে সুখে ও শান্তিতে বাস করিতে পারে, তজ্জন্য উদ্বিগ্ন হইলেন।

শত্রুগণ তাঁহাকে এখানেও শান্তিতে বাস করিতে দিল না। তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র অবলম্বন করিল। মদিনার লোক হজরত ও তদীয় শিষ্যদিগকে আশ্রয় দিয়া মক্কাবাসীদিগের যে তীব্র বিরাগ ভাজন হইবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। তাহারা মদিনাবাসীদিগের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করার প্রয়াস পাইল। হজরতকে তজ্জন্য সর্ব্বদাই হত্যাকারী ও গুপ্ত বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে সতর্ক থাকিতে হইত। ক্রমে মক্কা ও মদিনাবাসিগণের মধ্যে বদর নামক স্থানে এক যুদ্ধ সংঘটিত হইল। মক্কাবাসীরা এই যুদ্ধে পরাজিত হইল বটে, কিন্তু শত্রুতা পরিত্যাগ করিল না। হজরত যে সব লোককে বন্দী করিয়া আনিলেন তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াও কোন ফল পাইলেন না। যে সব বন্দীরা লেখাপড়া জানিত তাহাদিগকে তিনি এই সর্ত্তে বিনা ক্ষতিপূরণে ছাড়িয়া দিলেন যে তাহারা প্রত্যেকে দশজন লোককে লেখাপড়া শিখাইবে। ইহাতে জ্ঞানের প্রতি যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল প্রকাশ পাইতেছে। তিনি নিজে লিখিতে পারিতেন না, তজ্জন্য বোধ হয় এই অভাব অত্যন্ত বোধ করিতেন। সুতরাং অন্য মানুষ যাহাতে জ্ঞান-সম্পদ লাভ করিয়া সুখী হয়, তজ্জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাঁহার মহৎ হৃদয় অন্যের জন্য সর্ব্বদাই চিন্তিত ছিল। হিজিরা শকের দ্বিতীয় বৎসর অর্থাৎ ৬২৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পুনরায় কোরীশদের শত্রু আবু ছোফান কতিপয় মক্কাবাসীর সহিত মদিনার এলাকায় প্রবেশ করিয়া

যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এবার আহদ নামক এক পাহাড়ের নিম্নভাগে যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে মদিনাবাসীরা সংখ্যায় কম ছিল বলিয়া হারিয়া গেল। মক্কাবাসীরা জয়লাভ করিলেও মদিনা অবরোধ করিতে সাহস পাইল না, কেননা তাহাদের পক্ষীয় অনেক লোক হত ও আহত হইয়াছিল। সুতরাং তাহারাও মক্কায় ফিরিয়া গেল। এই যুদ্ধের পর মদিনা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের ইহুদিগণ ও মহম্মদের শিষ্যগণের সহিত বিবাদ বাধাইতে লাগিল। ইহারা নানা প্রকারের উপদ্রব সৃষ্টি করিল এবং মক্কাবাসীদিগের সঙ্গে মিলিয়া মদিনাবাসিগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। ইহাতে অনেক সময় মুসলমানদের ইহাদের সঙ্গে ঝগড়াবিবাদ হইতে লাগিল। দুইটী ইহুদী-বংশকে এইরূপ গুণ্ডামীর জন্য মদিনা হইতে বিতাড়িত করিতে হইল।

হিজিরার পঞ্চম বর্ষে মক্কাবাসিগণ পুনরায় দশ হাজার সৈন্য সহিত মদিনা আক্রমণের উদ্যোগ করিল। এবার মদিনাবাসীরা মাত্র ৩০০০ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিল। হজরত খুব সতর্কভাবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। মদিনার নিকটবাসী করাইজা বংশীয় একদল ইহুদীরা প্রবল ছিল। তাহারা ভিতরে ভিতরে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে মক্কার লোকদিকে সাহায্য করিতে লাগিল। অবশেষে তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং যুদ্ধের পর ইহাদের প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হইল এবং ইহাতে ইহারা শীঘ্র

আর শত্রুতা করিতে প্রয়াস পাইল না। ইহার পর আরবের অনেক লোক এই ধর্ম্মের প্রাবল্য দেখিয়া এই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল।

ষষ্ঠ-হিজিরা অব্দে হজরত যে সব এলাকায় প্রভুত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার অন্তর্গত স্থানসমূহের খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বিগণের ধর্ম্মস্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া তিনি একটা ঘোষণা সনদ্ প্রচার করেন। এই সনদ্ একটা বিশেষ গৌরবের বস্তু, কেননা ইহাতে ধর্ম্ম বিষয়ে মহম্মদের উদারতার বিশেষ পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হই। এই সনদ্ দ্বারা তিনি খৃষ্টানদের দাবী দাওয়া স্বীকার করিলেন এবং নিজ শিষ্যদিগকে সেই সমস্ত অধিকার লঙ্ঘন করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। এই সনদের উপর দৃষ্টি রাখিয়া এবং ইহাকে নজীর জ্ঞান করিয়া পরবর্ত্তী মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ বিজিত ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে বুঝিতে পারিতেন।

এই অধিকার পত্রে তিনি এবং তাহার অনুচরবর্গ যে খৃষ্টান প্রজাগণের ধনপ্রাণের রক্ষক তাহা তিনি স্বীকার করিলেন। তাহাদের উপাসনাগৃহ এবং তাহাদের ধর্ম্মযাজকগণেরও রক্ষা-বিধানের জন্য দায়িত্ব স্বীকার করিলেন। তিনি খৃষ্টানগণের উপর পীড়নমূলক কোন ট্যাক্স ধার্য্য করিলেন না। তাহাদের কাহাকেও তিনি বলপূর্ব্বক তাঁহার নবধর্ম্মে দীক্ষিত করা অন্যায় বলিয়া স্বীকার করিলেন, তাহাদের ধর্ম্মচর্য্যায় কোনোরূপ বাধা দেওয়া উচিত নয়, প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাহাদের

তীর্থযাত্রীদিগের তীর্থপর্য্যটনে কোনো বাধা থাকিবে না ব্যবস্থা করিলেন; খৃষ্টানগণের গির্জ্জা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া মসজিদ নির্ম্মাণ করারও কোনো প্রয়াস করিলেন না এবং ধর্ম্মপ্রচারে যুক্তিসঙ্গত উদার পন্থাই অবলম্বন করিলেন। কাহারো ধর্ম্ম-বিশ্বাসে তিনি আঘাত কখনো করিয়াছেন, কেহ বলিতে পারে না। তিনি অপরকে সত্য বুঝাইয়া ও সত্যপথে নিজ জীবন পরিচালিত করিয়াই ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এমন কি কোনো খৃষ্টান রমণী মুসলমানকে স্বামীপদে বরণ করিলেও তাহার নিজের ধর্ম্মাচরণে বাধা দেওয়া হইবে না, তিনি এইরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া দিলেন। খৃষ্টান প্রজাগণ গির্জ্জা নির্ম্মাণ কি অন্য কোনো ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করিলে, মুসলমানগণকে তিনি সেই সাহায্য দান করিতে উৎসাহ দিয়াছেন। অন্যকে তাঁহার নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী পন্থায় চলিতে সাহায্য করা তাঁহার মত উদার ব্যক্তির কর্ত্তব্য বলিয়াই তিনি বিবেচনা করিতেন এবং সেইরূপ দৃষ্টান্তই রাখিয়া গিয়াছেন।

হজরত মহম্মদের শিষ্যগণের মধ্যে আজও অনেক লোক এইরূপ উদার মনোভাবই পোষণ করেন, জানি। ধর্ম্ম বিষয়ে মুসলমান রাজগণের মধ্যে অনেকেই যে উদার-নীতির অনুসরণ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের বর্ত্তমান সময়ের খৃষ্টান প্রচারকগণের প্রচার-পদ্ধতি ও ভারতে সাত শত বৎসর ব্যাপী মুসলমান রাজত্বের প্রচার-পদ্ধতি যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে

তুলনা করা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় মুসলমানগণের উদারতার প্রশংসাই করিতে হইবে। মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ এদেশীয়দিগকে যেভাবে বিশ্বাস করিতেন ও উচ্চ উচ্চ শাসক পদে অভিষিক্ত করিতেন সেই সব কথা ইতিহাসে লিখিত আছে। সৈনিকবিভাগে কি ভাবে ক্ষত্রিয় ও হিন্দু যোদ্ধৃগণ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন তাহার তুলনা এখন আছে কি?

আমরা এখন যে ভাবে নিরস্ত্র ও বিশ্বাসের অযোগ্য বিবেচিত হইতেছি মুসলমান শাসকগণের নিকট সেইরূপ ব্যবহার আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পাইয়াছেন বলিয়া জানি না। কোনো কোনো শাসনকর্ত্তার ব্যবহার নিতান্ত সংকীর্ণ হৃদয়ের পরিচয় দান করে সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা বেশী নয় এবং তাহারা তজ্জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। মুসলমান রাজন্যগণের অধিকাংশ পরকালে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহারা পরকালবিহীন ছিলেন না। তাঁহাদের নরকভয় ও পাপ ভয় ছিল। কাজেই ধর্ম্মান্ধতা হইতে বিমুক্ত শাসকবর্গ ন্যায়ের পথেই চলিতেন। তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি তাঁহারা অনেক পরিমাণে রক্ষা করিতেন। আজকাল আন্তর্জাতিক সন্ধির সর্ত্তগুলি যে ভাবে লঙ্ঘন করা হয় এবং নির্লজ্জ ভাবে স্বার্থের পক্ষে যুক্তি-জাল বিস্তার করা হয়, তখন কেহ এই ভাবে স্বার্থান্ধ ছিলেন মনে হয় না। খামখেয়ালী বা প্রবৃত্তির দাস তাঁহারা কেহ কেহ ছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি আজকালকার ব্যবস্থাগুলি যে ভাবে হৃদয়হীনতার পরিচয় দান করে, তখন এইরূপ হৃদয়হীনতা দেখা যায় নাই। লোভ দ্বারা

অনেকে পরিচালিত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু আজকালকার লোকের লোভ অধিক প্রবল ও প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে। এই প্রচ্ছন্ন লোভ অধিক মারাত্মক ও ভয়াবহ।

হজরত মহম্মদ মক্কাবাসীদিগকে শত্রুতা হইতে নিরস্ত করার পর একটু সোয়াস্তি বোধ করিলেন। তিনি পারস্যাধিপতি ও রোমক সম্রাটের নিকট তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ পত্র পাঠাইলেন। আরব দেশের অনেকেই ইতিমধ্যে তাঁহার নব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাই তিনি এই সত্য ধর্ম্মের প্রচারের জন্য উৎসাহান্বিত হইয়া থাকিবেন। এই প্রকার অনুরোধ পত্র প্রেরণ করার পক্ষে এইমাত্র বলিলেই চলে যে তিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াই প্রচার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক ঈশ্বরের পূজা যে সত্য তিনি তাহা দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করিতেন। তিনি অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের দুর্নীতিপরায়ণতা দেখিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস অসত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। কাজেই এইভাবে অন্যকে তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করায় কোনোরূপ অন্যায় হইয়াছে, মনে করা যায় না। আজও শত শত প্রচারকগণ এই ভাবে নিজের মত প্রচার করিতেছেন; সভায় বক্তৃতা দিয়া নিজের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন; গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া অন্য ধর্ম্মের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিতেছেন। অনেকে স্কুল কলেজ স্থাপন করিয়া অপরিণত বয়সে বালক বালিকাগণকে নিজের বিশ্বাসে উৎসাহ দিতেছেন। হজরত মহম্মদের মতানুবর্ত্তীদিগের মধ্যে কোনো কোনো শাসনকর্ত্তা

যদি বলপ্রয়োগ করিয়া থাকেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে দায়ী করিতে পারি না। তিনি তরবারীর জোরে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, এই কথাটা নিতান্ত কাল্পনিক। কেননা তিনি এই ভাবে কখন কাহাকেও ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন নাই। তাঁহার জীবনচরিতে লিখিত হইয়াছে যে, সপ্তম হিজিরা অব্দে খাইবার-বাসী ইহুদীগণ বিদ্রোহী হয়। তাহারা পরাভূত হওয়ার পরও তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করা হয় নাই। তাহাদের জমিজমাও কাড়িয়া লওয়া হয় নাই। তাহারা যে ট্যাক্স দিতে বাধ্য হইল, তাহাও পীড়নমূলক বলিয়া জানা যায় না। তিনি শান্তির পথেই চলিতে চেষ্টা করিতেন। মক্কাবাসিগণ তাঁহার সঙ্গে সন্ধি করিয়া মদিনাবাসীদিগকে কাবাতীর্থে যাইতে অনুমতি দিলে পর তাহার শিষ্যগণ তথায় গেলেন। তখন মক্কাবাসিগণও সহর ছাড়িয়া কতকটা পৃথক এক স্থানে চলিয়া গেলেন এবং মদিনার লোক নির্ব্বিবাদে তীর্থ যাত্রা সমাপন করিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। মক্কাবাসিগণের বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া পরে প্রতিশোধ লইতে বাধ্য হইলেন। মক্কার একদল লোক হজরতের কতিপয় অনুচরকে বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্ব্বক হত্যা করে, তখন এই উপদ্রুত ও অত্যাচারিত লোকেরা তাঁহার নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করে। তিনি এত কাল মক্কাবাসীর বহু প্রকার দুর্ব্যবহার সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন দেখিলেন যে ইহারা কিছুতেই তাঁহার শিষ্যগণের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার করিবে না। হয় তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন

করিতে হইবে, নতুবা নিজের শিষ্যগণকে উচ্ছিন্ন হইতে দিতে হইবে ; আত্মরক্ষার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। সুতরাং তিনি মক্কা অধিকারের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। মক্কাবাসীরা তাঁহাকে এইবার বিশেষ বাধা দিতে পারিল না। তিনি কিছুকাল পূর্ব্বে যে নগর হইতে বিতাড়িত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আজ তথায় বিজয়ী বীরের ন্যায় প্রবেশ করিলেন। তিনি অতীত দুর্ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া ক্ষমা প্রদর্শন করিলেন। কেবল চারিজন লোকের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। কেন না, ইহারা গুরুতর অপরাধে অপরাধী ছিল। তাঁহার সৈন্যগণ কোনোরূপ লুটপাঠ করিতে সাহসী হইল না। কোনো নারীর প্রতি অত্যাচার বা অসদ্ব্যবহার করা হইল না। কেবল তাঁহাদের দেবদেবীর মূর্ত্তি ধ্বংস করা হইল। তিনি ত এইগুলি মিথ্যাধর্ম্মের প্রতীক বলিয়াই মনে করিতেন, কাজেই এইজন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। যাহার ধর্ম্মবিশ্বাস দৃঢ়, তিনি তাঁহার বিশ্বাস অনুযায়ী ব্যবহার করিবেন, তাহাতে তাঁহাকে নিন্দা করা যায় না।

কার্লাইল বলেন যে তুমি আমি ত এই ভাবে দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি না, কাজেই অন্য ধর্ম্মকে এই ভাবে অসত্য মনে করি না। বাস্তবিক পক্ষে, যিনি ঈশ্বরকে কোনো মূর্ত্তিতে আবদ্ধ দেখেন না, তাঁহার নিকট একটা মনুষ্য নির্ম্মিত মূর্ত্তির কোনো মূল্য নাই। যাঁহারা মূর্ত্তি পূজা করেন তাঁহারা ত

পূজার পর মূর্ত্তিটা ফেলিয়া দেন। তাঁহারা ত বলেন যে মুর্ত্তিতে পূজার পর আর দেবতা থাকেন না, কাজেই তাহাকে ফেলিয়া দিতে হয়। সুতরাং হজরত মহম্মদের এইরূপ ব্যবহারে বিস্মিত হবার কিছু নাই। তিনি মনে করিতেন ঈশ্বর এই জগতের কর্ত্তা ও প্রভু। তাঁহাকে কোনো মূর্ত্তিতে আবদ্ধ করা যায় না। তাঁহার ধর্ম্মের বিশেষত্ব হইল যে ঈশ্বরকে হৃদয়কে চিন্তা করিতে হইবে, বিশ্বের কার্য্যে তাঁহার কার্য্য দেখিতে হইবে, তাঁহার দয়া ও মঙ্গল ইচ্ছাতে এই জগতের কাজ চলিতেছে, এই বিশ্বাসে তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতে হইবে। তাঁহার কোনো মূর্ত্তি কাঠ বা পাথর দিয়া নির্ম্মাণ করার প্রয়োজনীয়তা হজরত মহম্মদ স্বীকার করেন না। তিনি চক্ষু মেলিয়াই বিশ্বে ঈশ্বরকে দেখিতেন। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র নদী বৃক্ষ ইত্যাদিতে ঈশ্বর রয়েছেন। তিনি বিশ্ব চালাইতেছেন এইভাবে তিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতেন। কাজেই তাঁহার ত মূর্ত্তির প্রয়োজন নাই। যাঁহারা এইরূপে সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরকে দেখেন, তাঁহাদের মূর্ত্তির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আজকাল অন্যের ধর্ম্মে এইরূপ আপত্তি করার মত বিশ্বাস কয়জনের আছে? ষষ্ঠ শতাব্দীর ব্যবহার বিংশ শতাব্দীতে চলিবে না। এখন অন্য ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াই চলিতে হইবে।

হিজিরা শকের নবম বর্ষে আরবের নানা স্থান হইতে বহু দূত আসিলেন এবং তাঁহারা ও তাঁহাদের বংশীয়েরা ইস্‌লাম

গ্রহণে অভিলাষী, এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। হজরত ও অন্যান্য প্রধান বিশ্বাসিগণ ইহাদিগকে আদর আপ্যায়নে প্রীতিদান করিলেন এবং উপঢৌকনাদি দিয়া স্বগৃহে প্রেরণ করিলেন। হজরত তৎপর এই নবধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য তত্তৎস্থানে প্রচারক প্রেরণ করিলেন। তিনি এই সমস্ত প্রচারকগণকে নিম্নলিখিতভাবে উপদেশ দিলেন, "তোমরা লোকদিগের সঙ্গে সস্নেহ ব্যবহার করিবে, কখনও ঘৃণার চক্ষে দেখিও না। অনেকে তোমাদিগকে স্বর্গের পথ জিজ্ঞাসা করিবে। তোমরা তাহাদিগকে বলিবে যে ঈশ্বর যে সত্য প্রকাশ করিয়াছেন তদনুসারে জীবন যাপন কর, সাধুকার্য্যে জীবন ব্যয় কর"। (আমির আলী) যখন সমস্ত আরবদেশ তাঁহার ধর্ম্মগ্রহণে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিল, তখন হজরত বুঝিলেন যে তাঁহার জীবনের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে এবং তাঁহার আর এ পৃথিবীতে বাসের অধিক দিন বাকী নাই। তিনি ৬৩২ খৃষ্টাব্দে ২৩শে ফেব্রুয়ারী সদলবলে মদিনা ছাড়িয়া মক্কাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মক্কাই ত ছিল তাঁহার জন্মস্থান। মদিনা ছিল তাঁহার সাময়িক বাসস্থান। তিনি মক্কাতেই সেই বৎসর ৭ই মার্চ্চ তারিখে সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে এক উপদেশ প্রদান করেন। এই উপদেশটী যিশুর পর্ব্বতোপরি প্রদত্ত উপদেশের ন্যায় মূল্যবান মনে করা হয়। তিনি এই উপদেশটী আরাফৎ নামক একটী পাহাড়ের উপরে একত্রিত সমবিশ্বাসিগণের উপকারের জন্য প্রদান করেন। তিনি বুঝিতে

পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী, তাই প্রাণের কথা তাহাদিগকে বলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

তাঁহার উপদেশের সারমর্ম্ম এইভাবে মিঃ আমীর আলীর গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা হইল। বিশ্বাসিগণ, বোধ হয় আমি আর এক বৎসরও ইহসংসারে থাকিবার হুকুম পাইব না। তোমাদের সম্পত্তি ও প্রাণ পরস্পরের নিকট রক্ষণীয় ও অবধ্য হইবে। স্মরণে রাখিও তোমরা শেষ বিচারের দিনে প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখীন হইবে। তখন তোমাদের সব কাজের জন্য জবাবদিহি হইতে হইবে। তোমাদের স্ত্রীগণের উপর যেরূপ তোমাদের অধিকার আছে, তোমাদের স্ত্রীগণেরও তোমাদের উপর তেমনই অধিকার আছে। অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করিবে। স্ত্রীগণের প্রতি সদয় ব্যবহার করিও। তোমরা যখন স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলে, তোমরা ঈশ্বরের নিকট শপথ করিয়াছ যে, তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে ও নিরাপদে রাখিবে। তাহাদিগের সঙ্গে তোমাদের যোগ এই প্রতিজ্ঞার বলেই পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। (অর্থাৎ ধর্ম্মজীবন যাপন করার জন্যই স্ত্রীকে তাঁহারা ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।)

তোমাদের দাসদাসীগণকে, তোমরা যে খাদ্য খাও তাহাই খাইতে দিবে। যেরূপ বস্ত্র তোমরা পরিধান কর তদ্রূপ বস্ত্র তাহাদিগকে পরিধান করিতে দিও। যদি তাহাদের দোষত্রুটি ক্ষমা না করিতে পার, তাহা হইলে তাহাদিগকে বিদায় দিও।

তাহারা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের দাস, কাজেই তাহাদের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিও না। তোমরা মনে রাখিও যে তোমরা সকলে এক ঈশ্বরের সন্তান এবং তজ্জন্য সকলে ভ্রাতা। তোমরা সকলে এক পরিবারভুক্ত। একজন অন্যের কোনো সম্পত্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক না দিলে লইও না। তোমরা সর্ব্বদা কোনোরূপ অন্যায় না করার জন্য সতর্ক থাকিবে। তোমরা, যাহারা উপস্থিত আছ, তাহারা অনুপস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দকে এই উপদেশের সারমর্ম্ম অবগত করাইও। হয়ত যাহারা তোমাদিগের মুখ হইতে আমার কথাগুলি শুনিবে, তাহারাই তোমাদের অপেক্ষা ভালরূপে মনে রাখিবে।" এইভাবে সমবিশ্বাসিগণকে উপদেশ দিয়া তিনি তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্য শেষ করিলেন।

এই সরল ও সংক্ষিপ্ত হৃদয়গ্রাহী উপদেশটি বিশ্লেষণ করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা দেখিতে পাই, যে-লোক প্রকৃত বিশ্বাসী তাঁহার নিকট সত্য প্রকাশিত হয়। কি ন্যায়, কি অন্যায়, তিনি সহজেই বুঝিতে পারেন। মানুষকে যদি ঈশ্বরের সন্তান ও আমরা সকলের ভাই, এই ভাবে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে বুঝিবার জন্য অধিক বলার আবশ্যকতা থাকে না। হজরত তাই বলিলেন যে পরস্পরের সম্পত্তি ও প্রাণ রক্ষা করিও এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক না দিলে কিছু গ্রহণ করিও না। ইহা অপেক্ষা ধনপ্রাণ সম্বন্ধে আর কোনো উপদেশের প্রয়োজন

নাই। স্ত্রী ও দাসদাসীগণের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে বলার তাৎপর্য্য এই যে, সেই সময় ইহাদের প্রতি দুর্ব্যবহার হইত। আরবেরা স্ত্রীলোকের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিত। কাজেই এই সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ দিলেন। দাস-দাসীগণের সম্বন্ধে যে উপদেশ দিলেন, তাহাও অত্যন্ত সমীচীন ও ন্যায্য। অন্য কোন দেশে সেই সময়ে এইরূপ উদার ব্যবহার দাসদাসীগণের প্রতি করা হইত বলিয়া জানি না। হজরত মানুষমাত্রকেই ঈশ্বরের দাস মনে করিতেন, তাই বলিলেন যে যাহাদিগকে দাসদাসী বলা হয়, তাহারাও প্রকৃত-পক্ষে ঈশ্বরের দাস। ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক সহানুভূতি দাসদাসীদিগের প্রতি করা যাইতে পারে? বাস্তবিক ঈশ্বরের নিকট আমরা আমাদের সকল প্রকারের কাজের জন্য দায়ী হইব, ইহা বিশ্বাস করিলে অন্য কোনো উপদেশের প্রয়োজন হয় না। প্রাচীন সময়ের লোকদের মধ্যে পরকালে বিশ্বাস দৃঢ় ছিল এবং তজ্জন্য আজকালকার ন্যায় বহু প্রকার আইন-কানুন ও বিচারালয় না থাকিলেও, লোকেরা ন্যায্য ব্যবহারই করিত। পরস্পরকে বঞ্চনা করার জন্য এত প্রকারের চেষ্টা হইত না। এখন লোকেরা যে ভাবে মিথ্যা কথা বলে, তখন লোকেরা এত মিথ্যা কথা বলিত না, কেন না, ঈশ্বর জানিতেছেন, তাহারা একথা বিশ্বাস করিত। হজরত মহম্মদ "পরকাল সত্য" নিজে বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহার সম-বিশ্বাসিগণও পরকাল সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন। কাজেই

তাঁহাদিগকে পরকালে যে ঈশ্বরের নিকট জবাবদিহি হইতে হইবে, সেই কথাটী স্মরণ করাইয়া দিলেন। আজকালও সরলবিশ্বাসী ইসলামের অনুবর্ত্তীগণের মধ্যে এই ভাবের সাধু ব্যবহার দেখা যায়। তাঁহারা বেশী কথা জানেন না এবং বলেন না ; কিন্তু তাঁহারা পরকালে একটা অটল বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হইয়া জীবন-পথে অগ্রসর হয়েন। তাঁহাদের জীবন নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক, এবং তাঁহারা এই সরল বিশ্বাসে বলীয়ান্ হইয়া সকল বিপদকে অনায়াসে সহ্য করিতে পারেন। গরীব শা নামে একজন ফকির ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে এক মুদীর ভৃত্য ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সরলবিশ্বাসী ছিলেন। বিশ্বাসবলেই দৈবশক্তি লাভ করিয়া পীর হইয়াছিলেন। তিনি এক দরগায় তিন দিন তিন রাত ধর্‌ণা দিয়া সাধনা করেন। তিনি পরে আদেশ পাইলেন যে, তাঁহার প্রার্থনা গৃহীত হইয়াছে এবং তিনি যাহা চাহিবেন তাহাই পাইবেন। তাঁহার কোনো কামনা ছিল না। তিনি চাহিয়াছিলেন ঈশ্বরকে, এবং ঈশ্বর তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইলেন। ইস্‌লাম ধর্ম্মের গৌরবই হইয়াছে সরল বিশ্বাস। এই ধর্ম্মে অন্য কোনো যোগ বা তপস্যার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর সত্য, তিনি জগত্ চালাইতেছেন। তিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি তাঁহার দাস। তাঁহার দাসভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে। পরের দ্রব্যে লোভ করিতে হইবে না। গরীব শার বৃত্তান্ত যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, তিনি হজরত মহম্মদের

একজন খাঁটী শিষ্য ছিলেন। হজরত মহম্মদকে আরবের জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠাতা বলা হইয়াছে। তাঁহার সময়ের পূর্ব্বে আরবদের মধ্যে কোনো একতা ছিল না। আরবেরা বহু শাখায় বা বহু গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। পরস্পরকে হিংসা ও দ্বেষ করাই ছিল নিয়ম। এক বংশ অন্য বংশের লোককে হত্যা করা অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করিত না। রীতিনীতি কতকটা এক ছিল বটে, কিন্তু কোনো শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল না। গোষ্ঠীপতিগণই কতকটা প্রভুত্ব করিতেন এবং বিবাদ-বিসংবাদ মিটাইয়া দিতেন। কোনোরূপ আইন কানুনের ধার কেহ ধারিত না। বলপ্রয়োগে যাহা করা যায় সকলেই তাহা করিত। পশুচারণই অধিকাংশ লোকের জীবিকার্জ্জনের পন্থা নির্দ্দিষ্ট ছিল। কেহ কেহ বাণিজ্য করিয়া জীবনধারণ করিত। মরুময় দেশে জীবনধারণ ছিল কঠিন। কাজেই এই ভাবে জীবন-সংগ্রামে নিরত ব্যক্তিগণের মধ্যে সভ্যতার আলোক বিস্তৃত হইবার বিশেষ অবসর ছিল না। কিন্তু যখন তাহারা ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়া হজরত মহম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল, তখন আর এইরূপ অরাজক ভাবে জীবন যাপন করা সম্ভব রহিল না। তাহাদিগকে অনেক বিষয়ে নিয়মাধীন হইতে হইল। হজরত তাহাদিগকে আত্মদমন করিতে বাধ্য করিলেন।

সমস্ত মুসলমান এক কেন্দ্রীভূত শক্তির নিকট বাধ্যতা স্বীকার করিল। হজরত আরবের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসন-

কার্য্য কি ভাবে চলিবে তাহা নিয়ন্ত্রিত করিলেন। লোকদের জীবিকা অর্জ্জনের পন্থাও কতকটা নির্দ্দিষ্ট হইল। বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসার জন্য বিচারক নিযুক্ত হইল। সকলকেই নিয়মাধীন হইতে হইল। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে যে বিবাদ ছিল, তাহা নিবারিত হইল ও যথেচ্ছভাবে লুট পাট করা বন্ধ হইল। হজরত মহম্মদ তাহাদের ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। প্রার্থনার ও সামাজিক বিষয়ের মীমাংসার জন্য মস্‌জিদ্‌ নির্ম্মিত হইল। মস্‌জিদে নিয়ম মত নেমাজ করার ব্যবস্থা হইল। একবার যখন লোকের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি খুলিয়া যায়, তখন তাঁহারা নবজীবন লাভ করেন। নিরক্ষর লোকেরাও অনেক গভীর সত্য বুঝিতে পারেন। তাই, আরবেরা এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অন্যান্য উন্নত ও সভ্য জাতি-গণের নিকট হইতে নানা প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া মহীয়ান্‌ হইলেন। হজরতের প্রদত্ত শিক্ষাতে জ্ঞানলাভ করিয়া ইহারা সংযত জীবন যাপন করিতে শিক্ষা করিল। মানুষ সংযম ব্যতীত কোন বিষয়েই অগ্রসর হইতে পারে না। ধর্ম্ম-বিশ্বাসই মানুষকে সংযত হইতে প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম্মবিশ্বাস মানুষের মনকে একটা অতীন্দ্রিয় জগতের দিকে আকর্ষণ করে। এই অতীন্দ্রিয় জগতের সৌন্দর্য্য এতই মোহকর যে, তাহার নিকট এই দৃশ্য-জগত হেয় মনে হয়। হজরত মরুবাসী বেদুইনগণকে এই অতীন্দ্রিয় জগতের দিকে আকর্ষণ করিলেন। তাহারা পূর্ব্বে কখনও এই খবর পায় নাই।

কাজেই যখন এই নূতন জগতের খবর স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিল, তাহাদের মনে একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উৎস খুলিয়া গেল। তাই তাহাদের মধ্যে অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষদের আবির্ভাব হইতে লাগিল।

হিজিরার দশম বৎসরে তিনি মদিনাতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। হজরত মহম্মদ পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার পার্থিব জীবনের অবসান নিকটবর্ত্তী। তিনি আত্মসমর্পণ করিয়া শেষ দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। একদা রাত্রিযোগে মদিনাতে অবস্থিত সমবিশ্বাসী ও সহযোগী বন্ধুগণের সমাধিস্থলে যাইয়া নিভৃতে প্রার্থনাতে ও ধ্যানে অনেক সময় অতিবাহিত করিলেন। বন্ধুদের জন্য তাঁহার শোকাবেগ প্রবল হওয়াতে তিনি বহুক্ষণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহার হৃদয়বত্তার প্রমাণ আমরা প্রতিক্ষেত্রে দেখিতে পাই। হৃদয়বান্ ছিলেন বলিয়াই তিনি জগতকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার দয়া ও সহানুভূতি ছিল অমানুষিক। তাই, অনেক কঠিন হৃদয় তাঁহার সংস্পর্শে বিগলিত হইত। দয়াপরবশ হইয়া তিনি অনেক রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। রমণীগণ সেই সময় পুরুষের আশ্রয় ব্যতীত নিতান্ত অসহায়া হইতেন। কাজেই এক পতির বহু স্ত্রী গ্রহণ করার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি জীবনের শেষ দিনগুলি তাঁহার আয়েসা নাম্নী স্ত্রীর (আবুবেকারের কন্যা) গৃহে যাপন করিয়াছিলেন। সেই গৃহটী মস্‌জিদের নিকটবর্ত্তী ছিল।

কাজেই সেই গৃহে বাস করিলে মস্‌জিদে যাতায়াত সহজে সম্পাদিত হইতে পারিত। যে পর্য্যন্ত দেহে শক্তি ছিল, তিনি সেই পর্য্যন্ত মস্‌জিদে যাইয়া উপাসনা করিতেন ও উপদেশ প্রদান করিতেন। একদিন বলিলেন. "হে ভক্তগণ, আমার কাছে তোমাদের কোন পাওনা আছে কি না, জানি না। যদি আমার ঋণ থাকে তবে আমার যা সম্পত্তি রহিল, তাহা তোমাদের প্রাপ্য হইবে।" ঋণ পাপ একটী গুরুতর পাপ বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রেও বিবেচিত হয়। পরদ্রব্য হরণ সব শাস্ত্রেই নিষিদ্ধ। হজরত মহম্মদ এই শেষ কথা বলিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, পরদ্রব্যে লোভ থাকিলে কোনোরূপ আত্মিক উন্নতি সম্ভব নহে। তাঁহার প্রত্যেকটী কথায় ও প্রত্যেকটী কাজে পরকাল যে আছে এবং আমরা আমাদের কার্য্যের জন্য দায়ী তাহা বুঝাইয়া দিতেন। অবশেষে বলিলেন যে যাঁহারা এই সংসারে অন্যায় কিছু করেন না এবং যাঁহারা এই সংসারের সুখ সুবিধার জন্য ব্যস্ত না হইয়া সত্য-পথে বিচরণ করেন, তাঁহারাই পরলোকে মহীয়ান্ হইয়া পুরস্কার লাভ করেন। ক্রমে তাঁহার শক্তি লোপ হইতে লাগিল এবং ৬৩২ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন তারিখে তাঁহার মহান্ আত্মা দেহবিমুক্ত হইয়া শান্তিময়ের ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিল। তাঁহার জীবনের শেষ দশ বৎসর জগতের হিতের জন্য ব্যয়িত হইল। তাঁহার প্রচারক-জীবনের বিস্তৃত ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। পাঠকপাঠিকাগণের জন্য আমি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ

আভাস দিলাম। মদিনাতে অবস্থিত তাঁহার সমাধিস্থান বিশ্বাসিগণের পক্ষে প্রধান তীর্থ স্থান।

তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব আধুনিক সময়ের নীতি ও ধর্ম্মের মাপ কাটিতে বিচার করা, ঠিক হইবে না। তাঁহার বিশ্বাসের জয় আমরা কীর্ত্তন করিতে বাধ্য। তাঁহার যুদ্ধ বিগ্রহ তখনকার নীতি অনুসারেই সংঘটিত হইয়াছিল। শত্রু-নির্যাতন তিনি সেই সময়কার নীতি অনুসারেই করিতেন। তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি যথা সম্ভব ঈশ্বরে বিশ্বাস লইয়াই কার্য্য করিতেন। আরবগণের মধ্যে বাস করিয়া সকল বিষয়ে আজ কালকার নীতি অনুসরণ করা সম্ভব হয় নাই। বহুস্ত্রীর পাণিগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে সেই দেশীয় রীতি অনুসারে তিনি চলিয়াছেন। এখনকার শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়া, আধুনিক সমাজতত্ত্ব স্বীকার করিয়া, তাঁহার অনুবর্ত্তন সকল বিষয়ে করা সঙ্গত হইবে না। আমরা যুক্তি অনুসারেই সামাজিক বিষয়ে চলিব। আধুনিক শিক্ষিত লোকের পক্ষে আরব সমাজের রীতি অবলম্বন করা সঙ্গত মনে করি না। তাঁহার ধর্ম্ম মতকেও আধুনিক শিক্ষার সহিত মিলিত করিয়া পরমত সহনশীলতা দ্বারা অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। তাঁহার ন্যায় জ্বলন্ত বিশ্বাস চাই বটে। কিন্তু আজকাল সেই ভাবে ধর্ম্মপ্রচার করা সম্ভব হইবে না। আমরা যদি প্রকৃত ভাবে বিশ্বাসী হইতে পারি, অন্য লোক আমাদের দৃষ্টান্ত দ্বারা উপকৃত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আবুবেকার, ওমর, ওসমান ও আলী

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইস্‌লামের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। ইস্‌লামের সাধক সাধিকাগণের মধ্যে কয়েকজনের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া ইস্‌লামের মহত্ত্ব কতকটা বুঝাইয়া দেওয়ার চেষ্টা মাত্র করা যাইতেছে।

হজরতের মৃত্যুর পর তদীয় বন্ধু ও শিষ্য আবুবেকারকে বিশ্বাসিগণ তাহাদের নেতৃত্বে বরণ করিলেন। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে আবুবেকার বয়োবৃদ্ধ ও সদ্বিবেচক বলিয়া সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। হজরত মহম্মদ পরিষ্কার ভাবে তাঁহার স্থানে কে নেতৃত্ব করিবেন বা খলিফা হইবেন বলিয়া যান নাই, কাজেই গণতান্ত্রিক নিয়মানুসারে মুসলমানগণ আবুবেকারকেই আচার্য্যপদে মনোনীত করিলেন। যিনি আচার্য্য তিনিই শাস্তা। তিনিই সৈন্য পরিচালনা করিতেন। শাসনযন্ত্রও তাঁহার দ্বারাই পরিচালিত হইত। যদি হজরত তদীয় জামাতা আলীকে খলিফা পদে মনোনীত করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে অনেক বিবাদ বিসংবাদ নাও ঘটিতে পারিত, এইরূপ অনুমান অনেকে করেন। তিনি বোধ হয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই মনোনয়ন অপেক্ষা অধিক পছন্দ করিতেন। তবে এই কথা

মনে রাখিতে হইবে যে যখন রাজশক্তি হস্তগত হয়, তখন নিতান্ত অল্পসংখ্যক লোকই বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হন। পার্থিব সুখলাভের আকাঙ্ক্ষাকে দমন রাখিয়া রাজা জনকের ন্যায় বা প্রজাবৎসল রামচন্দ্রের ন্যায় রাজ্যপালন করা অত্যন্ত কঠিন। উপরে যে চারিজন খলিফার নাম করা গেল ইহারা গুরুর উপযুক্ত শিষ্যই ছিলেন। তাঁহারা নির্লিপ্ত ভাবেই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া ইসলাম ধর্ম্মকে জয়যুক্ত করেন। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর অল্পকাল মধ্যেই ইস্‌লাম প্রচার করিতে যাইয়া তাঁহার শিষ্যবর্গ অনেক রাজ্য জয় করিলেন। আবুবেকারের সময়েই পারস্য সম্রাটের সঙ্গে বিবাদের সূত্রপাত হয় এবং ক্রমে তাঁহারা পারস্য, সিরিয়া, মিশর, পেলেষ্টাইন, বেবিলনিয়া প্রভৃতি রাজ্য অধিকার করেন। আবুবেকার মাত্র দুই বৎসর খলিফাপদে বৃত ছিলেন। তিনি পয়গম্বরের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া স্বীয় গুরুর গৌরব বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন একজন দৃঢ়বিশ্বাসী। কাজেই তাঁহার কার্য্যে দোষ ত্রুটী থাকিলেও কেহ তাঁহার বিরোধী ছিল না। হজরতের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর একটা অরাজকতা পুনরায় প্রবর্ত্তিত হয়। অনেকে আবার পৌত্তলিক পূজাপদ্ধতি প্রচার আরম্ভ করিল, কিন্তু আবুবেকার বিশ্বাসের জয় পুনরায় প্রবর্ত্তিত করিলেন। তিনি দৃঢ় হস্তেই রাজদণ্ড পরিচালনা করিলেন। সৈন্যদিগকে যুদ্ধযাত্রার প্রাক্‌কালে উত্তম উপদেশ দিয়া, তিনি বিদায় করিতেন; ন্যায় ও সত্য

অবলম্বন করার জন্য উৎসাহিত করিতেন। বালক বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকদিগকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি সৈন্যদিগকে খর্জুর বৃক্ষ ও পশু নষ্ট করিতে বারণ করিতেন। ধর্ম্মপ্রচারের ও আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে হইলে, যে ভাবে করা উচিত সেই ভাবে যুদ্ধ করিতে উপদেশ দিতেন। এইরূপ সংযত ভাবে যুদ্ধ করিয়া বিদ্রোহীদিগকে তিনি দমন করিতে সমর্থ হইলেন। এই সকল খলিফাদিগের সময়ে গবর্ণমেণ্টের যে আয় হইত তাহা রাষ্ট্রের সম্পত্তিরূপে ব্যবহৃত হইত। মুসলমান গণতন্ত্র ত্রিশ বৎসর মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই ইস্‌লাম নানা দিক দিয়া গৌরবান্বিত হয়। আবুবেকার যদিও খলিফা ছিলেন, তিনি প্রথমে কোনোরূপ বৃত্তি গবর্ণমেণ্টের তহবিল হইতে গ্রহণ করিতেন না। পরে বন্ধুগণের অনুরোধে কিঞ্চিৎ অর্থ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু মৃত্যুর সময় এই চিন্তা তাঁহাকে ব্যথিত করায়, উত্তরাধিকারিগণকে গবর্ণমেণ্ট হইতে গৃহীত অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য আদেশ করিলেন। তিনি গুরুর ন্যায়ই দীন ভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়া চলিয়া গেলেন। হজরতও মৃত্যুকালে একবারে নিঃস্বই ছিলেন। ত্যাগ দ্বারাই ইহারা মহত্ত্বলাভ করেন। আমাদের ঋষি বলিয়াছেন যে ত্যাগ দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়। লোভের ন্যায় পাপ আর কিছুই নাই। লোভ বিহীন জীবন দ্বারাই বিশ্বাস প্রমাণিত হয়। আবুবেকার মৃত্যুকালে ওমরকে খলিফা পদে মনোনীত করিয়া গেলেন।

মুসলমানগণ তাঁহার মনোনয়নকে সমর্থন করিলেন। ওমরের শাসনকালও নয় বৎসরের অধিক নহে। এই অল্প দিনের মধ্যেই ওমর ইস্‌লামের শক্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিলেন। ওমরের চরিত্রে নীতি ও ন্যায়পরতার সহিত কর্ম্মতৎপরতা বর্ত্তমান ছিল। লোকনায়কের মধ্যে যে ব্যক্তিত্ব থাকা প্রয়োজন তাহা তাঁহার ছিল। চরিত্রে দৃঢ়তা থাকাতে তাঁহার ক্ষমতা অব্যাহত ছিল। রাজকার্য্য পরিচালনায় তাঁহার প্রখর বুদ্ধি নিয়োজিত হইয়াছিল। শাসন কার্য্যের যে সুবন্দোবস্ত তিনি করিয়া গিয়াছেন তাহা পরবর্ত্তিগণের পথপ্রদর্শক হইয়াছে। যদি আততায়ীর হাতে তাঁহার অকাল মৃত্যু সংঘটিত না হইত, তাহা হইলে তিনি ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্য আরো সুবন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারিতেন। ওমর অর্দ্ধসভ্য আরবগণকে নীতির বন্ধনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিয়মানুবর্ত্তী জীবন যাপন করিতে বাধ্য করেন। শাসন কার্য্যেও নানাপ্রকার উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন। আলীর পরামর্শে তিনি রাজ্যের ভূমির জরিপ করাইয়া খাজানার হার ঠিক করিয়া দেন। শত্রু-দমনে তাঁহার যেরূপ দৃঢ়তা ছিল শাসন কার্য্যেও তদ্রূপ বুদ্ধি বিবেচনা তিনি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়েও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণের ধর্ম্মবিশ্বাসে কোনো বাধা দেওয়া হইত না। সকলেই স্বীয় স্বীয় বিশ্বাস অনুসারে ধর্ম্মচর্য্যার অনুষ্ঠান অবলম্বন করিবে, ইহার কোনো ব্যতিক্রম হয় নাই। একটী বিষয়ে মুসলমান ও অমুসলমান প্রজাগণের মধ্যে পার্থক্য

ছিল। মুসলমান প্রজাগণের ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান করিতে হইত, কিন্তু অমুসলমানগণকে ইস্‌লাম প্রচারের জন্য যুদ্ধে যোগদান করিতে হইত না। তাহাদিগকে তজ্জন্য কিছু অধিক ট্যাক্স দিতে হইত। ইহাই পরে জিজিয়া নামে ভারত ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে।* আরবেরা যে সব জাতিকে আপনাদের অধীনে আনিয়াছিলেন, তাহাদিগের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া একতা সম্পাদন করিতেন এবং স্বজাতীয়গণের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিতেন ঠিক সেইরূপ সমব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছেন। ওমর নিজে আন্তর্জাতিক বিবাহের খুব পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি আরবগণকে পৃথক সমাজভুক্ত রাখিতেই ইচ্ছুক ছিলেন। আরবগণের মধ্যে আরো ঘনিষ্ঠতর একতা সম্পাদন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল এবং সাম্রাজ্যের অবাধ বিস্তারেরও পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তিনি কৃষকগণের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করিতেন। কেননা তিনি জানিতেন যে রাজ্যের সমৃদ্ধি কৃষকগণের উপরেই নির্ভর করে। তিনি আরবগণকে বিজিত প্রজাগণের ভূমি অধিকার করিতে নিষেধ করিতেন। ভূমির মালিকের ও প্রজাগণের স্বত্ব ও অধিকার বজায় রাখার জন্য তিনি ব্যস্ত ছিলেন।

তাঁহার প্রবর্ত্তিত এই সমস্ত উদার রীতিগুলি আমরা

* এখন বৃটিশ শাসকেরা তাঁহাদের রাজ্য বিস্তারকল্পে যে সব যুদ্ধ হয় তাহাতে এদেশীয় হিন্দুমুসলমান সৈন্যদিগকে নিযুক্ত করা অন্যায় মনে করেন না। ভারতীয় রাজস্ব ব্যয় করিয়া নিজেদের রাজ্য ও প্রভুত্ব বর্দ্ধন করিয়াছেন ও করিতেছেন।

আমাদের দেশীয় কোনো কোনো মুসলমান শাসকের কার্য্যে অনুষ্ঠিত হইতে দেখি। বিন্‌কাশিম যখন সিন্ধু জয় করেন, তিনিও এইরূপ উদারনীতি অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণদের অধিকৃত ভূমি বা দেবোত্তর সম্পত্তি লোপ করেন নাই। রাজা জমিদার-গণের সঙ্গেও মুসলমান-শাসকগণ উদার রীতিই অবলম্বন করিতেন। মুসলমান-শাসকগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক ভাব এই সময়ে প্রবল ছিল। তাঁহাদের ধর্ম্ম মানবজাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা দেয়। কাজেই সম্রাটগণও জানিতেন যে, ভগবানের দরবারে রাজা-প্রজা এক মাপকাঠীতে তৌলিত হইবেন। ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ সকলেই যে ঈশ্বরের নিকট তুল্য, ইহা তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস শিক্ষা দিত। কাজেই প্রজারা তাঁহাদের ব্যবহারে উপদ্রুত বোধ করে নাই। বিজেতাগণ বিজিত-গণের জ্ঞানবিজ্ঞান গ্রহণ করিতে লজ্জাবোধ করেন নাই। ওমরের নামে যে একটী দুর্নাম কেহ কেহ রটনা করিয়াছেন যে তিনি এলেকজেণ্ড্রিয়ার লাইব্রেরী পোড়াইয়া দিয়াছিলেন, তাহা সত্য বলিয়া মনে হয় না। এই প্রকারের কার্য্য তাঁহার মত বুদ্ধিমান ও উদারভাবাপন্ন লোকের পক্ষে অসম্ভবই মনে হয়। পরন্তু, জুলিয়াস্ সিজার যখন এলেকজেণ্ড্রিয়া অবরোধ করেন, তখনই এই জগদ্বিখ্যাত পুস্তকাগারের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। এই পুস্তকাগারের অবশিষ্ট গ্রন্থসমূহ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সম্রাট থিয়োডসিয়াস্-এর রাজত্বকালে নষ্ট হইয়াছে বলিয়া কোনো কোনো লেখক বলেন।

থিয়োডসিয়াস্ খৃষ্টধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন এবং অখৃষ্টানগণের লিখিত শাস্ত্রকে হেয় মনে করিতেন। তাই তিনি এই সমস্ত গ্রন্থ নষ্ট করিয়াছেন বলিয়া মিঃ আমির আলী লিখিয়া গিয়াছেন। মুসলমানগণ পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকা দেশে রাজ্য বিস্তারের সময় ঈদৃশ সংকীর্ণ মনোভাব পোষণ করিতেন, মনে হয় না। কাফের-লিখিত শাস্ত্র অপাঠ্য বা হেয়, এই বিশ্বাসে তাহারা প্রণোদিত হইয়াছিলেন বোধ হয় না, কেন না, এই সময়ে তাঁহাদের মধ্যে অন্য জাতির নিকট হইতে জ্ঞান শিক্ষা করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান ছিল, দেখা যায়।

ওমরের মৃত্যু মুসলমানদের পক্ষে একটী অতীব হৃদয়-বিদারক দুর্ঘটনা। তিনি মিশর জয় করিয়া আসার পর মদিনায় বসিয়া শাসন কার্য্যের সুব্যবস্থা বিধানের চিন্তায় ও কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু একজন বিদেশী আততায়ীর হাতে তাঁহার মৃত্যু সংঘটিত হয়। এই লোকটী যে কেন তাঁহার প্রতি এত ঈর্ষ্যান্বিত ছিল, তাহা জানা যায় না। সে কোন দেশের অধিবাসী তাহাও সঠিক জানা নাই। তিনি আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পর ছয়জন প্রধান মুসলমানকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করার ভার দিয়া যান। তিনি যদি আলীকে মনোনীত করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে ইস্‌লামের পক্ষে ইহা মঙ্গলজনক হইত মনে হয়। কিন্তু তাঁহার মনোনীত কমিটী আলীকে অতিক্রম করিয়া ওসমানকে খলিফাপদে বরণ করিলেন। ওসমান এই উচ্চপদের অনুপযুক্ত ছিলেন।

ওমরের ন্যায় দক্ষ শাসনকর্ত্তা অল্পই দেখা যায়। তিনি হজরত মহম্মদ ও আবুবেকারের ন্যায় সাধাসিধে জীবন যাপন করিতেন। কোনো প্রকারের বিলাসিতা তাঁহার জীবনকে কলুষিত করে নাই। ক্ষুদ্রতম প্রজাও তাঁহার কাছে নিজের অভাব ও অভিযোগ জ্ঞাপন করিতে পারিত। মুসলমান রাজন্যবৃন্দের মধ্যে এই ভাবটা বরাবরই কতকটা দেখিতে পাওয়া যায়। আবুবেকারও রাত্রিকালে নগরে ভ্রমণ করিতেন ও দীনদুঃখী-গণের দুঃখ নিজের চক্ষে দেখিয়া প্রতীকার করিতেন। ওমরের মধ্যেও দীনদুঃখীদের প্রতি দয়ার ভাব প্রবল ছিল। ইঁহারা সকলেই হজরতের দরিদ্রের প্রতি বিশেষ অনুকম্পার কথা জানিতেন, এবং তাঁহার দৃষ্টান্তে দুঃখীর দুঃখমোচনে সতত ব্যস্ত থাকিতেন। আমরা পরে দেখিব যে, বাগদাদের খলিফা হারুন-অল-রসিদ এইভাবে দরিদ্রের দুঃখমোচনের জন্য ইতিহাসে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের ভারতীয় মুসলমান-শাসকগণ কেহ কেহ দরিদ্রের প্রতি বিশেষ অনুকম্পা প্রকাশ করিতেন। ইহাতে তাঁহাদের হৃদয়বত্তা প্রমাণিত হয়। আজকালের শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে হৃদয়ের পরিচয় আমরা কমই দেখি। এখনকার শাসনযন্ত্র যন্ত্রই বটে। ইহাতে হৃদয়ের পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায় না। মধ্যে মধ্যে দু'একজন সিভিলিয়ান হৃদয়বত্তা দেখাইয়া লোকপ্রিয় হইয়া উঠেন।

ওসমান ধার্ম্মিক, সাধু এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রবল অর্থাৎ শাসনদণ্ড পরিচালনার ক্ষমতা ছিল না।

তাঁহার বয়স হইয়াছিল সত্তরের উপর। এই বয়সে এইরূপ কাজ করা কাহারো পক্ষে সম্ভব নহে। তিনি পরিবারবর্গের কথামত চলিতেন ও তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতেন। ইহাতে রাজ্যে সুশাসন লোপ পাইল। মারওয়ান নামক জনৈক দুষ্টবুদ্ধি প্রিয়পাত্রের কথায় তিনি চলিতেন। আলী বা অন্য বুদ্ধিমান পরামর্শদাতাদের কথা বিশেষ গ্রাহ্য করিতেন না। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনকালেও আরবদের রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করিল সত্য, কিন্তু শাসনকার্য্যে শৃঙ্খলার অভাব হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার বিরুদ্ধে একটী বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার জীবন রক্ষার জন্য আলী ও তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা চেষ্টা করিলেন সত্য, কিন্তু রক্ষা করিতে পারিলেন না। দুইজন বিদ্রোহী, তিনি যে গৃহে ছিলেন, তাহার প্রাচীর আরোহণ করিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল ও তাঁহাকে হত্যা করিল। মৃত্যুকালে তাঁহার ছিয়াশী বৎসর বয়স হইয়াছিল এবং তিনি প্রায় বারো বৎসর খলিফাপদে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি ঈশ্বরে ভক্তিমান ও বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু ন্যায় লঙ্ঘন করিয়া মারওয়ানের পরামর্শে কার্য্য করিতেন। এই পাপের দণ্ড বিধাতা ইহজীবনেই তাঁহাকে প্রদান করিলেন। এই সময় হইতেই স্বার্থান্বেষণরূপ পাপ রাজকার্য্যে প্রবেশ করিল।

ওসমানের মৃত্যুর পর আলী নির্ব্বিরোধে খলিফাপদে বৃত

হইলেন। তিনি ছিলেন বিশ্বাসী, সাধু ও পণ্ডিত। ওসমানের শাসন সময়ে তিনি ও তাঁহার খুল্লতাত পুত্র আবদুল্লা (আব্বাসের পুত্র) উভয়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিস্তার করিয়া আরবের নব-জীবনের ভিত্তি দৃঢ় করিতেছিলেন। তাঁহারা দর্শন, ন্যায়, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে মসজিদে বক্তৃতা করিতেন। আধুনিক সময়ে জার্ম্মান-জাতির মধ্যে জাতীয়তা, সাহিত্য ও দর্শনের ভিতর দিয়া বিকশিত হইতে দেখা যায়। বাংলাদেশেও নব শিক্ষা জাতীয়-ভাব প্রচারে সাহায্য করিতেছে। আরবেরা এইভাবে নবধর্ম্মে দীক্ষালাভ করিয়া জ্ঞানরাজ্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। আব্বাসের বংশধরগণ যখন বাগদাদে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করেন, তখন আরবজাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। সেই উন্নতির সূচনা করিয়া দিলেন আলী ও আবদুল্লা। আলী পূর্ব্বতন খলিফাদের সময়ে মন্ত্রণা-সভার সভ্যরূপে সুপরামর্শ দিতেন, কিন্তু কোনো বিষয়ে বিশেষভাবে জড়িত হইতেন না। তিনি নির্লিপ্তভাবে জ্ঞানানুশীলনে ও ধর্ম্মচর্চ্চায় সময় অতিবাহিত করিতেন এবং নিজ পুত্রদিগের শিক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন। যখন তিনি খলিফাপদে উন্নীত হইলেন, তখনও পূর্ব্বের ন্যায় আড়ম্বরবিহীন জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার ন্যায় পবিত্র-চেতা ও উদারভাবাপন্ন আর কেহ তৎকালে ছিলেন না। কিন্তু এত সদ্‌গুণ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার শত্রুর অভাব হইল না। রাজশক্তি লাভ করিয়া ভোগ-বিলাস সম্ভোগের জন্য যদিও

তিনি ব্যস্ত ছিলেন না, তথাপি, যখন পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফার অন্যায় এবং অবিচারের সংশোধনের জন্য চেষ্টা করিলেন এবং অকর্ম্মণ্য কর্ম্মচারিগণকে বিদায় দিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হইতে দেরী হইল না। ওসমানের অকর্ম্মণ্য প্রিয়পাত্র-গণ তাঁহার উপর নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। ইহাদের মধ্যে সিরিয়া দেশের আমির আবু সুফিয়ানের পুত্র মুয়াবিয়া নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া এক প্রবল বিদ্রোহীদল গড়িয়া তুলিল। টালহা এবং যুবেইর নামক কোরিশবংশীয় দুইজন লোকও আলীর বিপক্ষতা করিলেন। মহম্মদ-পত্নী আয়েসাও এই ধূমায়মান হুতাশনে সমীরণ সংযোগ করিয়া প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিলেন। অবশেষে দুই পক্ষে একটি খণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হইল। খরইবা নামক স্থানে এই সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল। ইহাতে টালহা এবং যুবেইর নিহত হইলেন এবং আয়েসাও বন্দিনী হইলেন। এই গৃহবিবাদে মুসলমান রাজ্য ক্রমশ আদর্শ-বিচ্যুত হইতে লাগিল। আলী যথাসাধ্য ন্যায় ও সত্য বজায় রাখার জন্য যত্নবান্ হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে পুনঃপুনঃ বিদ্রোহ-দমনে ব্যাপৃত হইতে হইল। ছিফিন নামক স্থানে পুনরায় যুদ্ধ হয়। তিনি মুয়াবিয়ার সহিত বন্ধুভাবে বিবাদের মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মুয়াবিয়া তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল। তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও শত্রুপক্ষের চতুরতায় অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তাহারা তাঁহার সৈন্যগণকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। তিনি পুনরায় শত্রু নির্য্যাতন করিতে

বাধ্য হইলেন, কিন্তু বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হইল না। তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধুগণের অনেকে গুপ্তশত্রু কর্ত্তৃক বিষপ্রয়োগে নিহত হইলেন। অবশেষে তিনি নিজেও ৬৬১ অব্দের ২৭ জানুয়ারী তারিখে আততায়ীর হাতে প্রাণ হারাইলেন। তিনি পাঁচ বৎসর মাত্র খলিফাপদে বৃত ছিলেন। নানা সদ্‌গুণের অধিকারী হইলেও তিনি ওমরের ন্যায় শক্তিশালী ছিলেন না, ক্ষমাশীল ও উদার-চিত্ত লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সময়ে এই সমস্ত গুণের সহিত দৃঢ়তারও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। নির্ম্মম ভাবে অপরাধিগণকে তিনি দণ্ড দিতে পারিতেন না। তিনি যে সাহসী ও নিপুণ যোদ্ধা ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জ্ঞান চর্চ্চায় তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই সমস্ত মহদ্‌গুণ তাঁহার শাসন কার্য্যের অন্তরায়রূপে পরিণত হইয়াছিল। তথাপি মুসলমান ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি ছিলেন হজরতের প্রথম ও প্রধান শিষ্য এবং গুরুর উপযুক্ত শিষ্যই তিনি ছিলেন। হজরত তাঁহার সহিত প্রিয়তমা কন্যা ফতিমার বিবাহ দিয়াছিলেন। আলী জ্ঞান ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণে সর্ব্বজন-পূজিত ছিলেন। যে ভাবে মৃদুতা ও রুক্ষতা সমাবিষ্ট হইলে "দুর্দ্ধর্ষ" ও "অভিগম্য" হওয়া যায় সেই রুক্ষতা তাঁহাতে ছিল না। তিনি ইস্‌লামের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অন্যায়কে দৃঢ় হস্তে নির্ম্মূল করিতে পারেন নাই। এই মুয়াবিয়ার দলই পরে শক্তিশালী হইয়া ক্রমে প্রধান্য লাভ

করিল এবং গণতন্ত্রের নায়কদিগঁকে নিহত ও নিঃশেষ করিয়া যথেচ্ছাচার শাসন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিল। খলিফাগণের উচ্চ আদর্শ আর শাসন কার্য্যে স্থান পাইল না। ধার্ম্মিক নরপতি-গণের সঙ্গে তুলনা করিলে হজরত মহম্মদ হইতে আরম্ভ করিয়া আলীর সময় পর্য্যন্ত পাঁচজন শাসন কর্ত্তার শাসনকালকে গৌরবজনক যুগ বলা যাইতে পারে।

রোমান সাম্রাজ্যের একটা যুগকে ঐতিহাসিকগণ অত্যন্ত গৌরবজনক 'স্বর্ণযুগ' বলেন। মহামতি গিবন এই যুগকে "এইজ অব দি এ্যানটোনাইন" আখ্যা দিয়াছেন। এই সময়ে রোমক সাম্রাজ্যে শান্তি ও সুখ বিরাজ করিতেছিল। কিন্তু রোমক সাম্রাজ্যে ঈশ্বর-বিশ্বাসের স্থান বিশেষ ছিল না। জ্ঞানের প্রসার ছিল বটে, কিন্তু জ্ঞানের প্রতি লোকের এত শ্রদ্ধা ছিল না। মুসলমান খলিফাগণের গণতান্ত্রিক রাজ্যে ঈশ্বর-বিশ্বাস ও নীতির আদর্শ বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইয়া-ছিল। একটা বর্ব্বর জাতির মধ্যে নব জীবনের সঞ্চার হইয়া-ছিল। এই নবজীবন সমস্ত মানব জাতির উপর একটা প্রতিক্রিয়া সাধন করিয়াছে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে জগতের ইতিহাসে এই প্রকার গৌরবময় আর একটী যুগ বাহির করা সহজ হইবে না। ভারতের ইতিহাসে মোগল বংশের রাজত্ব কালকে গীবনের "এইজ অব দি এ্যানটোনাইন" এর সহিত তুলনা করা হয় বটে, কিন্তু মোগল রাজত্বকালকেও এই পাঁচজনের শাসন কালের সঙ্গে তুলনা করিলে, খলিফাদের

যুগের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে হয়। খলিফা যুগের সময় ধর্ম্ম ও নীতি যে ভাবে আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল, সেই ভাবে ধর্ম্ম ও নীতি অন্য কোনো রাজাদের আদর্শ হইতে বড় দেখা যায় না। মহারাজা অশোকের রাজত্বকাল ভারত-ইতিহাসে খুবই গৌরবের যুগ সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারত ত আরবের ন্যায় অর্দ্ধসভ্য দেশ ছিল না। ভারত তখন জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ভারত তখন জ্ঞান বিজ্ঞানের দিক দিয়া জগতের শীর্ষ স্থানায়ই ছিল। কিন্তু আরবের সভ্যতা তখন কোন স্তরে ছিল? এই নিম্নস্তর হইতে যাঁহারা আরবকে সভ্যতার উচ্চস্তরে লইয়া গেলেন তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের শক্তিমত্তা অদ্ভুতই বলিতে হইবে। যিশু যে স্বর্গরাজ্যের কথা শিক্ষা দিয়াছেন, সেই প্রকার স্বর্গরাজ্য অবশ্য ইহজগতে প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। কিন্তু খলিফাগণের পুণ্যময় রাজত্বকালে যে ভাবে মহৎ আদর্শকে জীবন যাত্রার আদর্শ করিয়া তোলা হইয়াছিল তাহাতে স্বর্গরাজ্যের আভাস কতকটা পাওয়া যায়। রাজকোষের অর্থ রক্ষার জন্য কোনো প্রহরী নিযুক্ত থাকিত না, তথাপি ধন অপহৃত হয় নাই। বিশ্বাসিগণ সকলে ভ্রাতৃভাবে প্রণোদিত ছিলেন। দরিদ্র ও দুঃস্থদিগকে যথাসম্ভব সাহায্য দেওয়া হইত। ইহা অপেক্ষা স্বর্গরাজ্যে কি অধিক প্রেম পাওয়া যাইবে? জগতের ইতিহাসে এই যুগটা অদ্ভুত এবং অভাবনীয় হইয়া রহিয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

অমেয়াদ্ বংশ

আলীর মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসন খলিফাপদে নির্ব্বাচিত হইলেন বটে, কিন্তু মুয়াবিয়ার শত্রুতায় অধিককাল এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিলেন না। মুয়াবিয়াই খলিফার পদ লাভ করিলেন এবং হাসন মদিনায় অবসর ভোগ করার জন্য চলিয়া গেলেন। তিনি তথায় কিছুদিনের মধ্যেই মুয়াবিয়ার পুত্র এজিদের ষড়যন্ত্রে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মুয়াবিয়ার পক্ষে খলিফার পদে বৃত হওয়া প্রথমতঃ নিতান্ত একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার মনে হয়, কেন না, মুয়াবিয়ার মুসলমান ধর্ম্মের জন্য কোনো উৎসাহ ছিল না। তথাপি তিনি মুসলমান সাম্রাজ্যের চালক ও নেতা হইয়া বসিলেন। তাঁহার বংশীয় নরপতিগণকে অমেয়াদ্-বংশীয় খলিফা বলা হয়। তাঁহারা ডামাস্কাস্ নগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রায় একশত বর্ষ প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা ক্ষমতা ও প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য কোনোরূপ অন্যায় করিতে দ্বিধা করিতেন না। মুয়াবিয়া যে প্রভূত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার বিজয়-নিশান অনেক দূর-বিস্তৃত স্থানসমূহে উড্ডীয়মান হইত। তিনিই আফ্রিকায় মুসলমান-রাজ্য বিস্তার করেন।

এই সময় পূর্ব্বদিকে ভারতবর্ষ, আফগানিস্থান প্রভৃতি স্থানে মুসলমান-শক্তি বিস্তৃত হইতে থাকে। মুয়াবিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে পুত্র এজিদকে খলিফাপদে মনোনীত করেন। এই সময় হইতেই গণতান্ত্রিক মনোনয়ন প্রথা রহিত হইয়া গেল। শাসন-কার্য্যে মুয়াবিয়ার ক্ষমতা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র এজিদ নির্দ্দয় ও ক্রুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। বিশ্বাস-ঘাতকতায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

মহরম উপলক্ষে যে হৃদয়বিদারক ঘটনার ইতিহাস আমাদিগকে স্মরণ করিতে হয়, সেই কারবালার হত্যাকাণ্ডের জন্য এজিদই দায়ী। যখন মুয়াবিয়ার সঙ্গে হাসনের সন্ধি হওয়াতে, হাসন অবসর গ্রহণ করেন ও মুয়াবিয়া খলিফাপদে বৃত হন, তখন কথা ছিল যে মুয়াবিয়ার পরে হাসনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হুসেন অর্থাৎ আলীর দ্বিতীয় পুত্র খলিফাপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। সুতরাং হুসেন মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর খলিফাপদে নিযুক্ত হওয়ার দাবী উত্থাপিত করিলেন। মুসলমানগণের অনেকে তাঁহার দাবী সমর্থন করিলেন। কিন্তু যখন এজিদের সঙ্গে যুদ্ধ সংঘটিত হইল, তখন তাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করিলেন না। তথাপি তিনি কারবালাতে তাঁহার পরিবার ও সাহায্যকারী বন্ধুগণের সঙ্গে উপস্থিত হইলেন। এই কারবালার শিবিরে হুসেন শত্রু কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ অবস্থায় জলতৃষ্ণায় অত্যন্ত ক্লেশভোগ করেন ও নৃশংসভাবে বিশ্বাসঘাতক শত্রুদের হস্তে পরিবারবর্গ সহ নিহত হন। বালকবালিকা ও স্ত্রীলোকদিগের

প্রতিও কোনোরূপ দয়া প্রদর্শন করা হইল না। এরূপ নির্দ্দয় কার্য্য মুসলমান-ইতিহাসে কমই দেখা যায়। হজরত মহম্মদের দৌহিত্র ও তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি এইরূপ হৃদয়হীন বর্ব্বরতা ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে এবং অদ্যাপি সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পুনরভিনয় করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করেন। মুয়াবিয়ার বংশধর অমেয়াদ্‌-খলিফাগণের মধ্যে অনেকে প্রভূত পরাক্রমশালী সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মবিস্তার অপেক্ষা রাজ্যবিস্তার ও রাজ্যশাসনে অধিক মনোযোগ দিয়াছিলেন, খ্যাতিও লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যে প্রণালীতে রাজ্য শাসন করিতেন তাহা প্রথম যুগের খলিফাগণের অনুসৃত পন্থা হইতে পৃথক হইলেও, তৎকালীন অন্যান্য রাজন্যবর্গের সঙ্গে তুলনা করিলে তাঁহাদিগের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কেন না, তাঁহারা মুসলমান-সভ্যতার উন্নতি ও বিস্তার কার্য্যে যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

মিঃ খোদাবক্স বলেন, "অমেয়াদ-খলিফাগণ যুদ্ধক্ষেত্রে বহুবার বিজয়লাভ করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এত ক্ষমতাশালী ছিলেন যে তাঁহারা যদি বাগ্‌দাদের খলিফাগণের ন্যায় শান্তি ভোগ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে হয়ত তাঁহারা জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারেও অধিক খ্যাতি লাভ করিতেন। তাঁহারা ইস্‌লামের বিজয়-নিশান বহুদূরবিস্তৃত দেশসমূহে উড্ডীন করিয়া গৌরবান্বিত হইয়া গিয়াছেন।" মিঃ

খোদাবক্স তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলেন যে তাঁহারা পণ্ডিতগণের আশ্রয়দাতা এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের প্রতি ঐতিহাসিকেরা সুবিচার করেন নাই। খৃষ্টানগণের প্রতি মুয়াবিয়ার ব্যবহার খুব উদারতাপূর্ণ ছিল। তিনি খৃষ্টান-চিকিৎসক ইবন্ অথলকে সাদরে আহ্বান করিয়া রাজদরবারে স্থান দেন এবং তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহ আরবীভাষায় অনুবাদ করাইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র নিন্দয় এজিদও কবি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন। খালিদ ইবন এজিদ্ বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং বহু গ্রন্থ আরবী-ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। এই বংশীয় রাজগণের উৎসাহে অনেক গ্রন্থ গ্রীক ও কপ্‌টিক ভাষা হইতে আরবীভাষায় অনূদিত হয় এবং তদ্দারা আরবীভাষা সমৃদ্ধশালিনী হইয়া উঠে। এই যুগের আরবগণ অন্য জাতির নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করিতে নিতান্ত উৎসাহী ছিলেন এবং বাগ্‌দাদ ও কর্‌ডবাতে যে বিদ্যার চর্চ্চা পরে আমরা দেখি তাহার সূত্রপাত এই ডামাস্‌কসের খলিফাগণ করিয়া দেন। বাস্তবিক পক্ষে বলিতে গেলে অমেয়াদবংশীয়গণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াই এবিছাইড-খলিফাগণ বিদ্যোৎসাহী হইয়া উঠেন ও অধিক খ্যাতি লাভ করেন। ইহাদের সময়েই গ্রীসের জ্ঞান-সমুদ্রের স্রোত আরবের মরুভূমির দিকে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল। পারস্যদেশের জ্ঞানরাশি মুসলমান পণ্ডিতগণকে আকর্ষণ করে বাগ্‌দাদের খলিফাগণের সময়ে। কিন্তু এই অমেয়াদগণের রাজত্বকালেই

ইতিহাস, দর্শন এবং বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হয়। সিরিয়াদেশে তখন গ্রীক্ দর্শন ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা হইত। কাজেই আরবগণ সিরিয়াবাসী লোক-দিগের জ্ঞানালোচনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। অরিষ্টটলের গ্রন্থসমূহের ও গ্রীক্‌দিগের অন্যান্য বিজ্ঞানের আদর এই সময় হইতেই আরবগণের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে এবং আরবগণ গ্রীক্-সভ্যতা ও গ্রীক্‌দিগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। এইরূপ জ্ঞান-পিপাসা আরবগণের মানসিক শক্তির পরিচয় দান করে। ইহা একটা বিস্ময়ের বিষয় এই যে যাঁহাদের মধ্যে সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে জ্ঞানের প্রতি এত শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহারা আধুনিক সময়ে কেন ইউরোপীয় জাতিগণের ন্যায় শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর নহেন ? আমাদের মনে হয়, তখন যেরূপ নব নব তত্ত্বান্বেষণে তাঁহারা আনন্দ পাইতেন, পরে ধর্ম্মের গোঁড়ামী দ্বারা পরিচালিত হইয়া সেই ভাবের স্বাধীন-চিন্তা বর্জ্জন করিয়াছেন। দর্শন বিচারে ভীত এবং ধর্ম্মের মতসমূহের অন্ধভাবে অনুসরণকারী মানুষের মধ্যে মৌলিক-চিন্তা জাগিতে পারে না।

চতুর্থ অধ্যায়

বাগ্‌দাদের খলিফাগণ

ইস্‌লামের ইতিহাসে বাগ্‌দাদের খলিফাগণের শাসনকাল আর একটী গৌরবময় যুগ। এই খলিফাগণ হজরত মহম্মদের খুল্লতাত আব্বাসের বংশধর ছিলেন। আব্বাসের পৌত্রের পৌত্র আবদুল্লা ছিলেন এই সাম্রাজ্যের প্রথম নরপতি। ছাফা নামেই তিনি ইতিহাসে পরিচিত। এই বংশের খলিফাগণ বাগ্‌দাদে ৭৪৯ হইতে তিন শত বৎসরের অধিককাল ১০৬৩ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, কিন্তু প্রথম এক শত বৎসর তাঁহাদের গৌরবময় যুগ। এই সময়ের মধ্যে যে নয় জন খলিফা বাগ্‌দাদের রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আট জন বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা অবশ্য সকলেই রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারা বেপরওয়া ভাবেই শাসন কার্য্য পরিচালিত করিতেন, কেহ তাঁহাদিগের শক্তি প্রতিহত করিতে পারিত না। তাঁহারা বহুলোকের প্রাণদণ্ড বিধান করিয়াছেন ; বিপক্ষগণকে নির্ম্মম ভাবেই হত্যা করিয়াছেন। তখনকার দিনে মানব জীবনের মূল্য বড় বেশী ছিল না। যদিও হজরত মহম্মদ জীবনের মূল্য জানিতেন এবং হীনতম ব্যক্তিও একই ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট বিশ্বাস করিতেন, তথাপি তাঁহার অনুচরগণ পূর্ব্বপ্রথা অনুসারেই শত্রুতা, মিত্রতা

ও লাভ ক্ষতির হিসাব করিতেন। সংসারী জীব হইয়া রাজত্ব পরিচালনা করিয়া উচ্চতমনীতি অনুসারে জীবন পরিচালিত করা সব সময়ে সম্ভব নহে। সময় সময় হয়ত আমরা উচ্চনীতি কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারি, কিন্তু আমাদের স্বল্পজ্ঞান ও ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ দ্বারা পরিচালিত হইয়া পূর্ণতা লাভ করা সহজ নয়। কাজেই আমরা যখন এই সকল প্রভূত ক্ষমতাশালী শাসন কর্ত্তাগণের কার্য্য সমূহের বিচার করি এবং তাঁহাদের দোষগুণ নির্দ্ধারণ করি, তাঁহাদিগকে আমাদের ন্যায় কামনা বাসনা দ্বারা প্রণোদিত মানুষ ভাবে বিচার করা কর্ত্তব্য। আমরা তাঁহাদের স্থলবর্ত্তী হইলে কি ভাবে দোষগুলি পরিহার করিতে সমর্থ হইতাম, এই ভাবে একটু যাচাই করিয়া দেখা ভাল। এই ভাবে উদার মনোবৃত্তি লইয়া যদি তাঁহাদের ইতিহাস অধ্যয়ন করি, তাহা হইলে তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতে সমর্থ হইব। আমরা এই সমস্ত নরপতিগণের ইতিহাসের সব ঘটনা পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত নহি। তাঁহাদের ন্যায়পরতা, শাসনকার্য্যে দক্ষতা, বিদ্যানুরাগ, সভ্যতাবিস্তার প্রভৃতি মহৎ কার্য্য গুলিরই উল্লেখ করিব। এইগুলি স্মরণ করিয়াই আমরা তাঁহাদিগকে ইস্‌লামের গৌরব বলিয়া মনে করি। পরের রাজ্য বলপ্রয়োগে হরণ করা বা পরদেশ যুদ্ধে জয় করা প্রশংসার কার্য্য বটে, কেননা শারীরিক বল ও যুদ্ধকৌশল দ্বারাই প্রাধান্য লাভ করিয়া স্বকীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে হয় এবং তদ্দারাই সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। এইরূপ পাশব শক্তির প্রশংসা আমরা

আজও করিয়া থাকি। আজও মানব-সভ্যতা এই পাশব শক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইংরাজেরা সামরিক শক্তি নিজেদের হাতে রাখিয়াই আমাদের উপর প্রভুত্ব করিতেছেন, তথাপি আমরা তাঁহাদের উদারভাবাপন্ন প্রগতিমূলক শাসন ব্যবস্থারই প্রশংসা করি এবং এই প্রগতিমুলক শাসন ব্যবস্থাই পাশব-শক্তিকে স্থায়িত্ব দান করিতেছে। পাশবশক্তি যখন সমাজের রক্ষা ও উন্নতি বিধান করে, তখন তাহাকে ঘৃণা করা যায় না। কেননা, শান্তি-রক্ষার জন্য এই পাশবিক শারীরিক শক্তির নিতান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। মুসলমানগণ এই ক্ষাত্র শক্তিতে তখন জগতে অজেয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথম ধর্ম্ম বিস্তার কল্পে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, সত্য ; তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইল। ক্রমে তাঁহাদের রাজত্ব লাভ হইল। এই ভাবে এখনও লোকেরা রাজ্য বিস্তার করিতেছে। তথাপি রাজ্যপালনে ও শাসন কার্য্যে যদি আমরা শাস্তার বুদ্ধি ও সহানুভূতির পরিচয় পাই, তাহা হইলে তাঁহার প্রশংসা করি। মানব-সভ্যতা এই ভাবেই প্রতিষ্ঠিত ও বিস্তৃত হইতেছে। মানুষের মধ্যে পশুভাব ও দেবভাব কার্য্য করে। এই দেবভাবের বিকাশ হয় নরপ্রীতিতে ও নরসেবায়। রাজ্যে যখন নরপ্রীতি ও নরসেবা প্রধান কার্য্য হইয়া ওঠে, কোনো রাজা যখন শক্তিলাভ করিয়া সেই শক্তি দ্বারা নরসমাজের উৎকর্ষ-লাভের ব্যবস্থা করেন, সকলকে প্রগতির পথ প্রদর্শন করেন, তখন তাঁহার হৃদয়বত্তা দেখিয়া সকলে

তাঁহার প্রশংসা করে। যিশু নিজে রাজত্ব করেন নাই, হজরত মহম্মদও করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের শিষ্য ও অনুচরদিগের মধ্যে অনেকে রাজশক্তি পরিচালনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই সকল শাসনকর্ত্তাগণ যখন পৃথিবীর রাজ্যকে স্বর্গরাজ্যের অনুরূপ করিয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন তাঁহারা প্রশংসা-ভাজন হন। যখন দেখি কোনো রাজা শক্তি প্রয়োগে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ; লোকের ধনপ্রাণ তাঁহার রাজ্যে নিরাপদ হইয়াছে ; লোকে উপদ্রুত হইলে রাজার সাহায্য লাভ করিয়া স্বাধিকার লাভ করিয়া সুখী হইতেছে ; লোকেরা শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি বিধান করার জন্য রাজার সাহায্য লাভ করিতেছে ; জ্ঞানের বিস্তার বশতঃ লোকের সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পাইতেছে ও লোক ন্যায়ধর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হইতেছে ; তখন এই রাজাকে আমরা আশীর্ব্বাদ করি ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। পিতামাতাগণ যেভাবে নিজ নিজ সন্তানের সর্ব্ববিধ মঙ্গলের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়েন, যখন আমরা কোনো রাজাকে রাজ্যের মঙ্গল-বিধানে সেই ভাবে উৎকণ্ঠিত হইতে দেখি তখন তাঁহার প্রশংসা করি। বিশেষতঃ আমাদের এশিয়া-খণ্ডে এই আদর্শ ই প্রাচীনকাল হইতে আদৃত হইয়া আসিতেছে। প্রজাগণ নিজ হাতে রাজ্যপরিচালনার জন্য আমাদের প্রাচ্যদেশ সমুহে ইচ্ছুক হয় নাই। রাজারাই তাহাদের মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। প্রজাগণ রাজাকে মান দিয়াছে, তাঁহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার দ্বারাই রক্ষিত ও পালিত হওয়ার

জন্য দাবী করিয়াছে। ইহাতে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, বলিয়া মনে করা যায় না।

বাগ্‌দাদের খলিফাগণের মধ্যে মনসুর, হারুনাল রসিদ ও মামুন বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। আব্বাস্‌-বংশীয় খলিফাগণ সকলেই ক্ষাত্রবীর্য্যে ও বুদ্ধিমত্তায় প্রশংসনীয় ছিলেন এবং সভ্যজনোচিত চরিত্রেও মহীয়ান ছিলেন। একজন ফরাসী-লেখক বলিতেছেন যে এই বংশের রাজত্বকাল মুসলমান-গণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভের যুগ। তাঁহারা যুদ্ধ-বিজয় অপেক্ষা সভ্যতা বৃদ্ধির দ্বারাই অধিক খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন। (আমীর আলী)। ইঁহাদের বিস্তৃত সাম্রাজ্য সমস্ত পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় পরিব্যাপ্ত ছিল। ইঁহাদের ক্ষাত্রবীর্য্যে ইউরোপও সন্ত্রাশিত হইয়া উঠিয়াছিল। মুসলমানগণ ইউরোপের অন্তর্গত স্পেনদেশ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে অধিকার করেন। স্পেনের শাসন-কর্ত্তাগণ ছিলেন অমেয়াদবংশীয়। ইঁহারা বাগ্‌দাদের খলিফা ছাপার ভয়ে ইউরোপের দিকে আসিয়া ৭৫৬ হইতে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রবল প্রতাপে স্পেন ও পর্ত্তুগাল দেশ শাসন করেন। ইঁহাদের রাজত্বকালে স্পেনের কিরূপ উন্নতিবিধান হইয়াছিল, আমরা তাহা পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব। উত্তর-আফ্রিকার দেশগুলি কিছুদিন পরে আব্বাস্‌বংশীয়দিগের অধিকার-বিচ্যুত হইয়া ফতেমাবংশীয়দের হস্তগত হয়। এই বংশীয়েরাই খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সিসিলী দ্বীপও জয় করিয়া

অধিকার করেন। ইতালীর দক্ষিণাংশেও আরবগণের বিজয়-নিশান উড্ডীয়মান হইয়াছিল। আরবেরা যে বীর্য্যবত্তায় শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মিঃ আমীর আলী বলেন যে ইঁহাদের এই শ্রেষ্ঠতার মূলকারণ ছিল তাঁহাদের ক্ষিপ্রগতিশীলতা, অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতা এবং সর্ব্বোপরি তাঁহাদের ধর্ম্মোৎসাহ। তাঁহারা এই সকল যুদ্ধে ধর্ম্মপ্রচারে উৎসাহ বশতঃ সংঘবদ্ধ হইয়াছিলেন; এবং উদ্যম ও অধ্যবসায় দ্বারা প্রণোদিত হইয়া অজেয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিজয়ে সত্যধর্ম্ম প্রচার হইবে এবং অসত্যধর্ম্ম লোপ পাইবে এই বিশ্বাসে তাঁহারা অমানুষিক শক্তিলাভ করিতেন। তাঁহারা যখন "আল্লাহো আকবর" বলিয়া সকলে একসঙ্গে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তাঁহাদিগকে প্রতিহত করা শত্রুগণের পক্ষে অসাধ্য হইত। মুসলমানগণের মধ্যে অদ্যাপি এই একতার ভাব দৃষ্ট হয়। ইতিহাসে বাগ্‌দাদের সমৃদ্ধির বর্ণনা পাঠ করিলে, আধুনিক সময়ের লণ্ডন বা নিউইয়র্ককে ও সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইবে না। বাগ্‌দাদ নগরীর প্রাসাদ মাত্রকেই রাজ-প্রাসাদ বলা যাইতে পারিত। অধিকাংশ গৃহ মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত ছিল। পৃথিবীর সকল জাতীয় লোকই তথায় দেখা যাইত। লোকসংখ্যা সহরতলী নিবাসী সমেত প্রায় বিশলক্ষ ছিল। সহরটী বৃত্তাকারে নির্ম্মিত হইয়াছিল। টাইগ্রীস্ নদীতীরে দ্বাদশ মাইলব্যাপী ব্যাসবিশিষ্ট এই বিস্তৃত নগরী

শোভা ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন স্বপ্নরাজ্যের ন্যায় বোধ হইত। সম্রাটগণের জাকজমক ও নগরীর সমৃদ্ধির অনুরূপই ছিল। নগরে বহুসংখ্যক মসজিদ্‌, কলেজ, হাঁসপাতাল ইত্যাদি সহরবাসীর সমৃদ্ধির গৌরব প্রচার করিত। পুরুষ ও স্ত্রীগণের পোষাক পরিচ্ছদ, গৃহের আসবাব, গীতবাদ্যের অনুশীলন, আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত সবই তখনকার দিনের পক্ষে প্রশংসাজনকই মনে করিতে হইবে। সভ্য জাতিগণ এখন যেরূপ সব বিষয়েই উন্নত প্রণালী অবলম্বন করিতেছেন, ইহাদের মধ্যে ও সকল প্রকারের উন্নতির জন্য একটা আগ্রহ ও চেষ্টা দেখা যাইত। প্রগতিমূলক শাসন ব্যবস্থা এই নরপতিগণ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সৈন্যবিভাগ নৌবিভাগ, শাসনপ্রণালী শিল্পচর্য্যা প্রভৃতি সবই যথাসম্ভব সুচিন্তিতভাবে পরিচালিত হইত। সহরে শান্তিরক্ষার নিমিত্ত পুলিশ পাহারার সুবন্দোবস্ত ছিল; কৃষকগণের অবস্থা সম্বন্ধে যত্ন লওয়া হইত, কেননা মুসলমান শাসকগণ মাত্রেই জানিতেন যে রাজ্যের সমৃদ্ধি কৃষকগণের উপর নির্ভর করে। পয়ঃ-প্রণালী নির্ম্মাণ করিয়া ক্ষেত্রে জল সরবরাহের ব্যবস্থা তাঁহারা বিশেষ মনোযোগের সহিত সম্পাদন করিতেন। জমির বন্দোবস্ত সম্বন্ধে ও ভারতবর্ষে যে সুচিন্তিত ব্যবস্থা আকবর এবং সেরশাহ প্রভৃতি সম্রাটগণ অবলম্বন করিয়াছিলেন, অধিকাংশ মুসলমান শাসন কর্ত্তাই তদ্রূপ ব্যবস্থা করিতেন। হারুণ-অল-রসিদের নাম আরব্যোপন্যাসের গল্পের সহিত বালক

বালিকাগণের নিকট সুপরিচিত। তিনি বাস্তবিকই রাত্রে ছদ্মবেশে নগরে ভ্রমণ করিয়া গরীব দুঃখীগণের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতেন ও তাহাদের দুঃখ মোচনের চেষ্টা করিতেন। তিনি ধার্ম্মিক ও ন্যায়বান্ নরপতি ছিলেন। যদিও তিনি রাজোচিত আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করিতে বাধ্য ছিলেন, তথাপি ভিতরের মানুষটী সরল সহজই ছিলেন। তিনি কর্ত্তব্য কার্য্যে তৎপর ছিলেন, সুতরাং যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন। যাহাতে রাজ্যের প্রজাগণের ধনপ্রাণ নিরাপদ থাকে, ব্যবসায়বাণিজ্যে তাহাদের কোনো প্রকার বাধাব্যতিক্রম না ঘটে, তজ্জন্য তিনি শান্তি রক্ষায় মনোযোগী থাকিতেন। তিনি রাজ্যে বিদ্যামন্দির, হাসপাতাল, সরাইখানা, পান্থনিবাস, সেতু, পয়প্রণালী ও রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়া প্রজাগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতেন, তিনি পণ্ডিত ও শিল্পীগণের রক্ষক ও পালক ছিলেন। অবশ্য যথেচ্ছাচারী রাজশক্তির পরিচালনায় সময় সময় যে কোনো কোনো লোকের উপর তিনি ও মামুনের ন্যায় জুলুম না করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডাধিপতি যে ভাবে রাজদণ্ড ধারণ করিয়া মন্ত্রীগণের সাহায্যে রাজকার্য্য সমাধা করেন, সেই সময়কার রাজগণের পক্ষে তাহা সম্ভব ছিল না। তাঁহাদের ক্ষমতা ছিল অনেক বেশী, দায়িত্ব ও ছিল অনেক অধিক। সুতরাং অনেক সময় তাঁহারা ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র খলিফা মামুন ও একজন প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। ধর্ম্ম ও জ্ঞানানুশীলন সম্বন্ধে তাঁহার

খ্যাতি হারুন-অল-রসিদের অপেক্ষাও অধিক। বস্তুতঃ আব্বাসবংশীয় খলিফাগণের মধ্যে মামুনেরই অধিক প্রশংসা ইতিহাসে লিখিত আছে। তাঁহার বীর্য্যবত্তা, সাহস, ধীরতা, বিচারবুদ্ধি, বদান্যতা ও বুদ্ধিমত্তা অতুলনীয় বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে। তাঁহার বিশবৎসর ব্যাপী রাজত্বকাল ইস্‌লাম ইতিহাসের অন্যতম সর্ব্বোত্তম যুগ বলা যাইতে পারে। তাঁহার সময়ে ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী আরবগণের মধ্যে জ্ঞানরাজ্যের নানা শাখায় অভূতপূর্ব্ব উন্নতি লাভ হইয়াছিল। অঙ্কশাস্ত্র জ্যোতির্বিদ্যা, ভেজষবিদ্যা, রসায়ণশাস্ত্র, দর্শন, সাহিত্য, কবিতা ইত্যাদি সর্ব্ব বিষয়ে বহুলোক খ্যাতি লাভ করেন।

তিনি বিদ্যানুশীলনে সাহায্যের জন্য এইরূপ চিরস্থায়ী বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন যে, পরবর্ত্তী শাসকগণ যেন কোনো প্রকারের বাধা না জন্মাইতে পারেন। তাঁহার সময়ে সমস্ত এশিয়ার নানা স্থান হইতে বিজ্ঞলোকদিগকে আহ্বান করিয়া লইয়া যাওয়া হইত। ভারতবর্ষ হইতে বৈদ্যশাস্ত্রে অভিজ্ঞ অনেককে হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে পণ্ডিতলোকদিগকে সাহায্য করা হইত ও অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করা হইত। তাঁহার মন্ত্রণা-সভায়ও প্রজাগণের মধ্য হইতে সকল জাতীয় প্রধান লোকদিগকে নিযুক্ত করা হইত। মুসলমান, ইহুদি, খৃষ্টান ও পার্সিক-ধর্ম্মাবলম্বী পরামর্শদাতাগণ তাঁহার মন্ত্রী-সভায় স্থান পাইতেন।

ধর্ম্মবিষয়েও তিনি উদারমতাবলম্বী ছিলেন। সকলেই স্বাধীনভাবে ধর্ম্মচর্য্যা ও ধর্ম্মানুশীলনের অধিকার ভোগ করিত। অবশ্য তাঁহার কর্ম্মচারিগণ সময় সময় তাঁহার উদারনীতি লঙ্ঘন করিতেন, কিন্তু তিনি নিজে অত্যন্ত যুক্তবাদীই ছিলেন। বস্তুতঃ, বিচার করিলে অন্য কোনো মুসলমান নরপতি এত যুক্তিবাদী বলিয়া জানা নাই। তাঁহার সময়ে মুতাজিল নামে একটী যুক্তিবাদী সম্প্রদায় বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারা অধুনাতন ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় বিশ্বাসকে যুক্তি দ্বারা সমর্থন করিতেন। মামুন কোনো প্রকার অযৌক্তিক ধর্ম্মমত সমর্থন করিতেন না। তিনি স্বীয় প্রতিভার চক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে কালে ইস্‌লামে অযৌক্তিক মতবাদ গড়িয়া উঠিবে, এবং তাহাতে স্বাধীন চিন্তা বন্ধ হইবে ও মানসিক শক্তি বিকাশের বাধা উপস্থিত হইবে। তিনি অযৌক্তিক মতবাদ মোটেই সমর্থন করিতেন না। তাঁহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি যে সত্য, এখন তাহা প্রমাণিত হইতেছে। যুক্তিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া যে ইস্‌লামের প্রগতি কতকটা বন্ধ হইয়াছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন। শাসন-ব্যবস্থা যাহাতে ধর্ম্মের নিগড় হইতে মুক্ত হইতে পারে এবং ধর্ম্ম শাসন-যন্ত্রের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত না হয়, তজ্জন্য তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ইস্‌লামের প্রাচীনব্যবস্থা ও আইন-কানুন বিশেষভাবে জানিতেন। তিনি তাঁহার ওস্তাদের নিকট হইতে দার্শনিক বিচার-বুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উদারচেষ্টা

ফলবতী হয় নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফাগণ মুতাজিলদিগকে নানাপ্রকারে উৎপীড়ন করেন এবং যুক্তিবাদিগণের উচ্ছেদ সাধন করিয়া দেন। মামুন নিজেই মুতাজিল-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং তিনি এই সম্প্রদায় দ্বারা ইস্‌লামের প্রভূত মঙ্গলসাধন হইবে মনে করিয়া, ইহার মতবাদ প্রচার করিতে প্রয়াস পাইতেন। তাঁহার এই উদার নীতির তুলনা একমাত্র মহারাজা অশোকের ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে করা যাইতে পারে। এরূপ যুক্তিবাদী নরপতি বর্ত্তমান বা প্রাচীন ইতিহাসে দুর্ল্লভ। ইউরোপের কোনো শাসনকর্ত্তা এইভাবে বিদ্যানুশীলনের ও যুক্তিবাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া জানি না। কেবল মার্কাস ওরেলিয়াস্ নামক রোমক-সম্রাটের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে এইভাবে বিশ্বাস করিতেন না। তিনি একেবারেই যুক্তিবাদী ছিলেন এবং নিজের জীবন শুদ্ধ করার জন্যই অধিক ব্যস্ত ছিলেন। তিনি যে খৃষ্টানদিগের উপর অত্যাচার করিতেন, তজ্জন্য তাঁহার স্তাবকেরা দুঃখিত আছেন। মামুন কিন্তু অন্য ধর্ম্মাবলম্বীগণকে ধর্ম্মসাধনায় পূর্ণ অধিকার দিয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে বলিতে গেলে এইরূপ উদাররীতি পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্ল্লভ। মনসুর ছিলেন তাঁহার পিতামহ এবং হারুণলরসিদ ছিলেন তাঁহর পিতা। এই তিনজন বাস্তবিক ইস্‌লামের প্রধান গৌরবস্থান। তাঁহাদের রাজত্বকাল পৃথিবীর ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়াথাকিবে।

বাগ্‌দাদে আরব-কৃষ্টির কি কি বিষয়ে বিশেষ উৎকর্ষলাভ হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। আরবেরা নাবিকগণের ব্যবহৃত কম্পাস প্রথম নির্ম্মাণ করেন। সমুদ্রগামী পোতারোহণে তাঁহারা নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহারা আফ্রিকার উপকূলে, ভারতমহাসমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে, মালয়উপদ্বীপে এবং ভারতের উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। বাণিজ্যব্যপদেশে তাঁহারা বহুদেশে যাতায়াত করিতেন। ভারতবর্ষ ও চীনে তাঁহারা বাণিজ্যের জন্য যাতায়াত করিতেন। আরবেরা আজোরিজ দ্বীপ অধিকার করিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহারা আমেরিকা পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। আফ্রিকার বহুস্থানে তাঁহারা বাণিজ্যের জন্য যাতায়াত করিতেন। এই সময়কার পণ্ডিতগণ ব্যাকরণ, অলঙ্কার-শাস্ত্র, অভিধান ভূগোল, জীবনচরিত প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা তাঁহারা মানব-জাতির জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁহারা নানা বিষয়ের জ্ঞান-বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। রসায়ণ-শাস্ত্র, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, জীববিদ্যা, ও অন্যান্য বিজ্ঞান তাঁহারা অধ্যয়ন করিয়া সমৃদ্ধ করিয়া ছিলেন। আবু মুছা জাফর নামে পরিচিত বৈজ্ঞানিককে রসায়ন-শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। একাদশ শতাব্দীতে যখন সুলতানমামুদ ভারতবর্ষ বহুবার লুণ্ঠন করেন, তখন আল্‌বেরুণী নামে জগদ্বিখ্যাত মুসলমান-পণ্ডিত ভারতবর্ষে আসিয়া-

ছিলেন। তিনি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র ও দর্শনাদি অধ্যয়ন করিয়া হিন্দুদের কৃষ্টি সম্বন্ধে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, এরূপ গ্রন্থ আজও অন্য কেহ লিখিতে পারেন নাই। বাগ্‌দাদে চিকিৎসা শাস্ত্রের বিশেষ অনুশীলন হইত। ইতিহাসে মুসলমান লেখকগণের বিশেষ খ্যাতি রহিয়াছে। প্রত্নতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধেও তাহারা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রের ও বিশেষ আলোচনা তাঁহারা করিয়াছেন। আরবী ও পারসীক ভাষায় বহু কবি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। পারসীক ভাষায় যাঁহারা কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ফারদৌসী ও ডেকিকার নাম অমর হইয়া থাকিবে। ইহারা উভয়েই সুলতান মামুদের সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

আরবেরা দর্শনশাস্ত্রের ও আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। মুতাজিল সম্প্রদায় যে ভাবে যুক্তি মার্গ অবলম্বন করিতেন, এবম্বিধ যুক্তিমার্গ প্রাচীন সময়ে আর কেহ অবলম্বন করিতে সাহস পান নাই। তাঁহারা বিশ্বাসকে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধর্ম্মকে দর্শনের ভিত্তিতে গড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা মৃত্যুর পর মৃতদেহে পুনরায় জীবন সঞ্চার হইবে বিশ্বাস করিতেন না; ভোগবিলাসপূর্ণ স্বর্গ-রাজ্যের অস্তিত্বেও বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু এই সম্প্রদায় বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। গোড়ামী সব ধর্ম্মেই রহিয়াছে এবং তদ্দারা স্বাধীন চিন্তার স্রোত বন্ধ হইয়া যায়। একাদশ শতাব্দীতে বোধ হয় আরবকৃষ্টির পূর্ণ যৌবন লাভ

হইয়াছিল, কিন্তু ক্রুজেভের সময় যে বিপদ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল, তাহাতে তাঁহদের আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হওয়াতে কৃষ্টি নষ্ট হইয়া গেল। এই অবনতির সময় তাতারদের আক্রমণে বাগদাদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। তাতারগণ বর্ব্বর ছিল। তাহারা পণ্ডিতগণকে হত্যা করিল, গ্রন্থাদি পুড়াইয়া নষ্ট করিয়া দিল। ইউরোপের কৃষ্টি ও আরবগণের দ্বারা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিল। আরবেরা যে স্পেন অধিকার করিয়া পাঁচশত বৎসরের অধিককাল তথায় রাজত্ব করেন, সেই কথার উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে। গ্রেণাডা ও করডবা আরবদের শক্তিকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। আরব শাসনের সময় গ্রেণাডা প্রদেশ বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এই প্রদেশে ত্রিশটী নগরী, আশীটী দুর্গ সমন্বিত সহর এবং প্রাচীরবেষ্টিত বহু সহস্র গ্রাম গড়িয়া উঠিয়াছিল। গ্রেণাডা সহর প্রাচীরবেষ্টিত হইয়া সুরক্ষিত দুর্গের ন্যায় নির্ম্মিত হইয়াছিল। সহরে কুড়িটী সিংহদ্বার দিয়া লোক যাতায়াত করিত।

দুর্গটি সহরের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান ছিল। প্রত্যেকগৃহের সংলগ্ন বাগানে নানাবিধ ফল ও পুষ্পবৃক্ষ শোভা পাইত। জলের ফোয়ারা ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া লোকেরা আনন্দ উপভোগের ব্যবস্থা করিয়াছিল। তাহাদের বাড়ী ঘর সৌন্দর্য্য-ভূষিত ছিল। গ্রেণাডায় চারি লক্ষ নাগরিক বাস করিত। সহরের বর্ণনা পাঠ করিলে রাজ্য যে সুশাসিত ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। সহরের অদূরে একটি পাহাড়ের উপর অন্য

একটি দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার নাম ছিল ইবন-উল-হামার। এই নাম রূপান্তরিত হইয়া 'আলহাম্ব্রা'তে পরিণত হইয়াছে। এখানে চল্লিশ হাজার সৈন্য বাস করিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। স্বর্গীয় স্থপতিগণের নির্ম্মিত বলিয়া এই সহরের খ্যাতি লোকমুখে শুনা যাইত। ইহার অসাধারণ নির্ম্মাণ-কৌশল ও কারুকার্য্য লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিত। করডবা সহর শিয়ারা-মারণা নামক পর্ব্বতের সানুদেশে অর্দ্ধবৃত্তাকারে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই নগরটীও বহু সৌধ-সমন্বিত হইয়া সুন্দর হইয়া উঠিয়াছিল। নাগরিক-দিগের জন্য জল সরবরাহের অতি উত্তম ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সহরের মধ্যে স্থানে স্থানে মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত জলাধার ও জলাশয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। বাড়ী, ঘর, মসজিদ, মাদ্রাসা, পুস্তকাগার—সবই বিশেষ যত্নের সহিত নির্ম্মাণ করা হইত। খলিফা সহর হইতে অনতিদূরে 'অজজারা' নামক মর্ম্মরপ্রস্তর নির্ম্মিত অলৌকিক শোভাসম্পন্ন অট্টালিকাতে বাস করিতেন। আমরা আরব্যোপন্যাসে যে সব স্বপ্নপুরীর কথা পাঠ করি, খলিফাগণ সেই স্বপ্নকে বাস্তব করিয়া তুলিয়াছিলেন। করডাবতে তিন হাজার আট শত মসজিদ নগরবাসিগণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ষাট হাজারের অধিক সৌধরাজি নগরের শোভা বর্দ্ধন করিত। এই নগরকে 'জগতের অলঙ্কার' নাম দেওয়া হইয়াছিল। এই নগরের অধিবাসীর সংখ্যা ছিল দশ লক্ষের উপর।

আরব-শাস্তাগণ অনেক বিষয়েই সভ্যতার উচ্চমঞ্চে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শাসনপ্রণালী উন্নত প্রকারের না হইলে এরূপ সমৃদ্ধিলাভ সম্ভব হইত না। তাঁহাদের সামাজিক রীতিনীতি দ্বারাও ইউরোপের সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ইউরোপীয় যোদ্ধাগণ যে নারীগণের রক্ষা ও সাহায্যের জন্য 'নাইট' উপাধি ধারণ করিয়া পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেন ও আমাদের দেশীয় স্বয়ম্বর-প্রথায় অনুষ্ঠিত যুদ্ধের ন্যায় 'টুরনামেণ্ট' যুদ্ধ করিতেন, ইহা আরবীয় যোদ্ধৃগণের নিকট হইতে তাঁহারা শিক্ষা করেন। আরবীয় যোদ্ধা-গণ নারীগণের প্রতি বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন এবং নারীগণের নিকট হইতে এই শ্রদ্ধা ও প্রেমের প্রতিদান লাভার্থে পরস্পরের সহিত লড়াই করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেন। "The brave deserve the fair"—(সুন্দরী কন্যা বীরভোগ্যা)—এই কথাটী নাইটগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আরবীয় বীরগণই বীরত্ব ও শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়া নারীর অনুগ্রহ লাভের প্রথা ইউরোপকে শিক্ষা দিয়া ইউরোপে যে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা দেখা যায়, তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া দেন। ক্রমে এই 'টুরনামেণ্ট' যুদ্ধের নানা প্রকার নিয়ম ও আইন-কানুন গঠিত হয় এবং এই প্রথা দ্বারা ইউরোপীয় সামাজিক জীবন বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়।

খলিফা-সম্রাটগণ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহারাই করডবা ও গ্রেণাডায় ইউনিভারসিটি (বিশ্ববিদ্যালয়) স্থাপন করিয়া

নানা প্রকারের জ্ঞানানুশীলনের ব্যবস্থা করেন। এই উভয় সহরের পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিত। ইহারা নানা প্রকারের কলা ও সাহিত্যের আলোচনা করিতেন। সম্রাটগণ বৃত্তি ও অর্থদান করিয়া বিদ্বান ব্যক্তিগণকে পোষণ করিতেন। মহিলারাও নানা বিদ্যায় ভূষিতা ছিলেন। মিঃ আমীর আলী কতিপয় বিদুষী রমণীর নাম করিয়া বলিতেছেন যে শ্রীমতী নাজুন, জেনাব, হাম্‌ডা, হাফশা, আলকালীয়ে, ছাফিয়া, মেরিয়া অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। আরবী-সাহিত্যের পাঠক অবশ্য এই সকল মহীয়সী নারীগণের গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকিবেন। আরবদের ইউনিভারসিটিতে আমাদের দেশের 'কনভোকেসনের' ন্যায় বার্ষিক "সমাবর্ত্তন" অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইত। এই সময় নানাস্থানের পণ্ডিতগণ সমবেত হইতেন এবং কবি ও বক্তাগণ স্ব স্ব গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। ইউনিভারসিটিদ্বয় তাঁহাদের সিংহ-দ্বারের উপর নিম্নলিখিত সত্যটী খোদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

"পৃথিবী চারিটী স্তম্ভের উপর স্থাপিত। প্রথমটী পণ্ডিত-গণের জ্ঞান, দ্বিতীয় স্তম্ভ শাসকগণের পক্ষপাতশূন্য বিচার, তৃতীয় স্তম্ভ ধার্ম্মিকগণের ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা এবং চতুর্থ স্তম্ভ বীরগণের বীর্য্যবত্ত্বা। ইউনিভারসিটিতে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে বিদ্বানদিগকে উচ্চপদে মনোনীত করা হইত। পণ্ডিত ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগকে মুসলমান পণ্ডিতগণের ন্যায় বৃত্তি দিয়া ভরণপোষণ করা হইত।"

রাজ্যশাসনের যেরূপ বন্দোবস্ত দেখা যায়, তাহাতে বুঝা যায় যে স্পেনের খলিফাগণ বাগদাদের খলিফাগণের ন্যায়ই রাজ্যের শাসন ও রক্ষণ করিতেন। কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য তৎকাল-প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুসারে তাঁহারা যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। স্পেনে যাহা উৎপন্ন হইতে পারে, তাঁহারা তাহা কৃষকগণকে উৎপাদন করিতে উৎসাহ দিতেন। ধান্য, ইক্ষু এবং কার্পাসের চাষে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইত। জলপাই ও দ্রাক্ষালতার চাষও স্পেনে লাভজনক ছিল। এই সব বিবেচনা করিলে তাঁহাদিগকে প্রজা-হিতৈষী শাসক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়; তাঁহারা কেবল বিলাস-ভোগে নিমগ্ন থাকিতেন, এই সিদ্ধান্ত করা যায় না। বীরজাতির মধ্যে অবশ্য ভোগের আদর্শ প্রধান হইয়া উঠে। আধুনিক সময়ে ত সকলেই ভোগবিলাসী। মুসলমান-খলিফাগণ ধর্ম্মবিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁহারাই অন্ততঃ নামে আচার্য্যপদে বৃত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে উপদেষ্টার আসনে বসিতে হইত। কাজেই উপদেশ দেওয়ার ক্ষমতালাভের প্রয়োজন হইত। ধর্ম্মের ইতিহাস, ধার্ম্মিকগণের চরিত্র ও জীবনী তাঁহাদের জানিতে হইত।

মুসলমানগণের মধ্যে আজও অনেক লোক আছেন, যাঁহারা ধার্ম্মিক লোকগণের বিবরণ হজরত মহম্মদ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অবগত আছেন। আধুনিক ইংরেজী শিক্ষিতেরা এই বিষয়ে অজ্ঞ এবং আধুনিক বালক-

বালিকারা মুসলমান ভক্ত ও শাসকগণের বিষয় বিশেষ কিছু শিখেন না। মুসলমানগণের ইতিহাসে অগৌরবের কথা আছে, কিন্তু গৌরবের কথা জানাই অধিক প্রয়োজন। আমরা তাঁহাদের গৌরবের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম।

পঞ্চম অধ্যায়

তুর্কীগণ

ইস্‌লামের গৌরবময় যুগ যে অবসান হইয়া যায় নাই, তাহার প্রমাণ চতুর্দ্দিকেই দেখা যায়। ইস্‌লাম কেবল পাশবিক বা সামরিক বলে বলীয়ান হইয়া বিজয়নিশান উড্ডীন করে নাই। যে তাতার জাতি নিতান্ত বর্ব্বর ও অসভ্য ছিল, তাহারা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পরাক্রমশালী জাতি হইয়া উঠে। তাহারাই এবিছাইড্ খলিফাগণের ধ্বংশ সাধন করিয়া নিজেরা পরাক্রান্ত হয়। তাহারাই রোম সাম্রাজ্যের পূর্ব্বাংশ জয় করিয়া ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে কনষ্টাণ্টিনোপোল অধিকার করে। ইরোপীয় তুর্কিস্থানের খলিফাগণের গৌরব জাজ্বল্যমানই রহিয়াছে। বিগত উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ইউরোপীয় শক্তিনিচয় তুর্কীদিগকে ইউরোপ হইতে একেবারে বিতাড়িত করিয়া দিবার জন্য বহুবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যে সব কারণে তাঁহারা এই বিদ্বেষ মূলক কার্য্য করিতে সমর্থ হয়েন নাই, তন্মধ্যে তুর্কীদিগের বীরত্ব ও যুদ্ধনিপুণতাই প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথারাইনের সময় হইতেই রুশসম্রাটগণ বিশেষভাবে তুর্কীগণকে ইউরোপ হইতে দূরীভূত করার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন এবং বিগত মহাসমরের সময়ও যে এই বিষয়ে চেষ্টা না হইয়াছে তাহা নহে। কিন্তু

এই বিংশ শতাব্দীতে ও কামালপাশা তাঁহার বীরত্ব ও শাসন ক্ষমতা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে ইস্‌লাম ধর্ম্মের অনুচরগণের মধ্যে এখনও যে শক্তি লুক্কায়িত আছে, তাহার পরিণতি লাভ হইলে, এই বৈজ্ঞানিক যুগেও কেহ তাহাদিগকে পশ্চাতে ঠেলিয়া দিতে পারিবে না। যাঁহারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস পোষণ করেন ও তাঁহার পূজা করেন তাঁহারা কখনই দুর্ব্বল হইতে পারেন না। কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে। ইসলামীয় সমাজেও সেই পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। এবং ঈজিপ্ট, পারস্য এবং আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশে বর্ত্তমান সময়ের জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচারিত হইতেছে। ধর্ম্মানুশীলন ও ধর্ম্মচর্য্যাও কতকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, আশা করা যায়। মূল সত্য যতদিন বজায় থাকিবে, ততদিন এই ধর্ম্ম মানবজাতির পক্ষে গৃহীতব্যই থাকিবে। আমাদের বঙ্গদেশীয় প্রধান পণ্ডিত পরলোকগত স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় বলিতেন যে ইস্‌লাম ধর্ম্ম যদি তাহার গণ্ডীগুলিকে একটুকু বিস্তার করে ও ইস্‌লামকে বিশ্বজনীনভাব দান করিতে পারে, তবে এই ধর্ম্ম মানবজাতির ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম হইয়া উঠিতে পারে। অর্থাৎ এখন কোরাণ বা হজরত মহম্মদকে যে ভাবে গ্রহণ করা হয়; ভবিষ্যতে ঠিক এই ভাবে গ্রহণ না করিয়া, মানুষ যখন ইহার মূল সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে ও নীতির পথে জীবন যাপন করিয়া এক ঈশ্বরের পূজার আবশ্যকতা স্বীকার পূর্ব্বক মানবজাতির অন্তর্গত সকলের সাম্যে

বিশ্বাসী হইয়া উঠিবে, তখন ইস্‌লামের গৌরব বহুগুণে বর্দ্ধিত হইতে পারিবে। ইস্‌লাম ক্ষুদ্রতম মানবকেও গৌরব দান করে। তাহা অন্য ধর্ম্ম ব্যবস্থায় দেওয়া সহজ নহে। ব্যক্তি বিশেষকে ঈশ্বরের স্থলবর্ত্তী বিবেচনা করিলে, মানুষকে সাম্যদান করা হইল না। ইস্‌লাম কোনো ব্যক্তি বিশেষকে সেইরূপ প্রাধান্য দান করে বলিয়া আমরা মনে করি না।

ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বিগণ যখন বর্ত্তমান সময়োপযোগী শিক্ষা-লাভ করিয়া যুক্তির সঙ্গে ভক্তির ও বিশ্বাসের যোগসাধন করিতে প্যারিবেন ও যুক্তিকে বরণ করিয়া লইবেন, তখন বোধ হয় এই ধর্ম্মের আশ্রয়ে অনেক লোকের স্থান হইবে। পৃথিবীতে অগ্রসর জাতির অনেকে আজকাল ধর্ম্মকে বাদ দিয়া চলিতে চাহিতেছেন। তাহার কারণ ধর্ম্মব্যবস্থা সমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষ তিরোহিত করিতে হইলে, কোনো বিশেষ ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিতে হইবে না। এবং সকলের সঙ্গেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে পোষণ করিতে হইবে। হজরত মহম্মদের শিক্ষার মূল কথা একেশ্বরে বিশ্বাস এবং ইহাই ধর্ম্মের ভিত্তি। ঈশ্বর আছেন। তিনিই জগতের কর্ত্তা। আমরা তাঁহার দয়া ও মঙ্গল ইচ্ছা দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছি। ইহা অপেক্ষা আর কি সত্য প্রধান হইতে পারে? আপামর সকলেই এই বিশ্বাসে আস্থাবান্। ঈশ্বরের অস্তিত্ব আকাশের দিকে তাকাইলেই প্রমাণিত হয়। নিজ নিজ হৃদয়েও আমরা

সেই প্রমাণ লাভ করি। আমরা আছি। তিনিই হৃদয়ে থাকিয়া আমাদিগকে পথ দেখান ও ভাল শিক্ষা দেন। তিনিই আমাদিগকে এই সংসারে লইয়া আসিয়াছেন এবং লইয়া চলিয়াছেন জীবন-পথে। এই সব তত্ত্বের আরো প্রচার হওয়া আবশ্যক।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতীয় মুসলমানগণ

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা অনুসারে যে সব বালক বালিকা আধুনিক শিক্ষালাভ করিতেছে, তাহাদের অনেকেই ভারতের ইতিহাস পাঠ করে না। কাজেই মুসলমানগণ এদেশের অধিবাসী হইলেও তাঁহাদের মহত্ত্ব বা গৌরব কোথায়, এবং তাঁহারা এদেশে কি ভাবে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা জানে না। তজ্জন্য আমরা ভারতীয় মুসলমান শাসকগণের সম্বন্ধে কিছু বলিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা শেষ করিতে চাই। এই গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্য পাঠক পাঠিকা-গণকে ইস্‌লামের গৌরবের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া। ইস্‌লামের কৃষ্টি সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ লেখা হইয়াছে এবং হইতেছে। পাঠকগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া যদি ইস্‌লাম সম্বন্ধে আরো জানিবার জন্য উৎসাহান্বিত বোধ করেন, তবেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। মুসলমানগণ যে বীরত্বে একরকম অপরাজেয় ছিলেন, তাহা ইতিহাস পাঠক জানেন। তাঁহারা যে অতি সামান্য কারণেও প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহা ইতিহাসে লিখিত আছে। অন্য ধর্ম্মের প্রতি যে অবজ্ঞার ভাব তাঁহারা অনেকে পোষণ করেন, তাহা বর্ত্তমান শিক্ষা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। শাসন কর্ত্তাগণের অনেকে কিন্তু এই সংকীর্ণ

চিত্ততা হইতে মুক্ত ছিলেন এবং হিন্দু ও মুসলমান প্রজাগণের প্রতি সমব্যবহারই প্রদর্শন করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ উদার ব্যবহারের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন। আকবর বাদশাহ এই উদার নীতির প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার রাজ্যশাসন প্রণালী আজও গৌরবের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। তিনি ভারতে এক জাতি বা Nation প্রতিষ্ঠার জন্য সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সমান ব্যবহার করিয়া, জাতিগঠনের সুত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। বাদশাহ ঔরংজেব ব্যতীত তাঁহার বংশ-ধরেরাও তাঁহার উদার নীতিরই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের শাসনকালে ভারতের গৌরব পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

ভারতের শিল্প ও কৃষ্টি তখন অন্য কোনো দেশের শিল্প বা কৃষ্টি অপেক্ষা হীন ছিল না। ভারতের সমৃদ্ধি ও অন্যান্য দেশের সমৃদ্ধি অপেক্ষা অধিকই ছিল। ভূমি সম্বন্ধে তাঁহারা যে সব সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাপি তাহাই আমাদের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর ভিত্তি হইয়া রহিয়াছে। জরিপ দ্বারা জমির পরিমাণ নির্ণয়ের ব্যবস্থা তাঁহারাই করিয়া দিয়াছেন। ইংরেজ শাসকগণ সেই ব্যবস্থা মানিয়া লইয়াই ভূমি সম্বন্ধে ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। কোনো কোনো বিষয়ে মুসলমান শাসকগণের ব্যবস্থা বর্ত্তমান ব্যবস্থা অপেক্ষাও সমীচীন ও প্রজার পক্ষে হিতকর ছিল। এখনকার বন্দোবস্ত অনুসারে প্রজাগণ যে ভাবে উৎপীড়িত ও দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট হইতেছে, তাহা

পূর্ব্বে দেখা যায় নাই। দেশের দরিদ্র প্রজাগণ এখন যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত, এইরূপ দুর্দ্দশা পূর্ব্বে তাহাদের ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে বাহিরের পোষাক পরিচ্ছদ মনোজ্ঞ হইতেছে সত্য, কিন্তু ভিতরকার অবস্থা অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়িতেছে। বহু কারণের সমবায়ে লোকের ক্লেশের মাত্রা বর্দ্ধিত হইতেছে।

মুসলমান শাসনকালে স্থপতি বিদ্যায় বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণের নির্ম্মিত মসজিদ, দুর্গ ও অন্যান্য সৌধমালা আজও তাহাদের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। আগ্রার তাজমহলের কীর্ত্তি ভুবন বিদিত হইয়া রহিয়াছে। আরো অনেক স্মৃতি মন্দির উত্তর ভারতে তাঁহাদের গৌরব ঘোষণা করে। বিদেশাগত ভ্রমণকারিগণ আজও তাঁহাদের নির্ম্মিত সৌধমালা দর্শন করিয়া বিস্ময়ে পুলকিত হইয়া থাকেন। দীল্লির জুম্মা মসজিদের ন্যায় মসজিদ্ সমগ্র এসিয়া-খণ্ডে আর নাই। তাঁহাদের শাসনকালে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পেরও বিশেষ খ্যাতিলাভ হইয়াছিল। মুসলমান শাসন কর্ত্তাগণ দেশীয় শিল্পের উৎসাহদাতা ছিলেন। দক্ষ শিল্পীগণকে তাঁহারা বিশেষ পুরস্কার দান করিতেন। তাঁহারা এদেশীয় শাস্ত্রগ্রন্থেরও সমাদর করিতেন। আকবর বাদশাহের বদান্যতা এই বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনিই প্রথম সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিবার জন্য উৎসাহী হইয়াছিলেন। তাঁহার সভায় সকল মতাবলম্বী জ্ঞানিগণ স্ব স্ব ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করিতেন। তিনি সকল ধর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হওয়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা

করিতেন। একটী নূতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্যও চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। হিন্দু রাজন্যগণের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার রীতি তিনিই বিশেষ ভাবে প্রবর্ত্তন করেন, কেননা তিনি হিন্দুগণের সদ্‌গুণের আদর জানিতেন। তাঁহার মত গুণগ্রাহী লোক ইতিহাসে অল্পই দেখা যায়। সাজাহান বাদশার পুত্র দারাও হিন্দুশাস্ত্রের জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রপিতামহ আকবর বাদশাহের ন্যায় উদার মত পোষণ করিতেন। বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা হুসেন শাহ বংলা ভাষার উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিয়া অমর কীর্ত্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের বাংলা রামায়ণ ও মহাভারতের জন্য আমরা মুসলমান শাসন কর্ত্তাগণের নিকট ঋণী আছি। মুসলমান ধর্ম্মের একেশ্বরে বিশ্বাস দ্বারা যে আমাদের একেশ্বরে বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে, এই কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমাদের মধ্যে যে সব সাধক একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই যে মুসলমানগণের একেশ্বরবাদ প্রবর্ত্তনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, এই কথা ভূমিকায় উল্লেখ করা হইয়াছে। জাতিভেদের নিগড় যে জাতিভেদ বিহীন মুসলমান সমাজের দৃষ্টান্ত দ্বারা শিথিলতা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। মুসলমান ধর্ম্মের সাম্যবাদ, মুসলমান ভ্রাতাগণের একতা ও সাধাসিধে ধর্ম্মভাব যে সাধারণ অশিক্ষিত লোকের মধ্যেও আলোচিত হয়, একথা আমরা জানি। বহু

বাউল সম্প্রদায় আজও মুসলমান কি হিন্দু ঠিক করিয়া বলা যায় না। ইহাতে মুসলমান ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি পাইতেছে। মুসলমান সাধকগণের বৈরাগ্য ও ফকিরী আমাদের নিকট আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় মহাত্মা গান্ধীকে 'ফকির' নামে অভিহিত করা হয়। 'ফকির' উপাধি সর্ব্বত্যাগীর পক্ষে শোভা পায়। মুসলমান বাদশাহগণের মধ্যে কেহ কেহ বাস্তবিক ধার্ম্মিক জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। ঔরঙ্গজেব বাদশাহ যদিও হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ দুর্ণাম অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, তথাপি তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও কার্য্যপরতন্ত্রতা ও কর্ম্মকুশলতার প্রশংসা সকলেই করিয়াছেন। তিনি যদি বাদশাহের পুত্র না হইয়া কোনো মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে হয়ত আজও তাঁহার বিদ্যাবত্তার ও ধার্ম্মিকতার প্রশংসা তাঁহার স্মৃতিকে উজ্জ্বলভাবে জাগাইয়া রাখিত।

হজরত মহম্মদ সম্বন্ধে কতিপয় উপাখ্যান

১। হজরত মহম্মদের নিকট গ্রেবিয়েলের আগমন ও ঈশ্বরের আদেশ জ্ঞাপন—রমজান মাসের ২৫ কি ২৭ তারিখ করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায় হজরত যখন নিদ্রিত ছিলেন, গ্রেবিয়েল হিরাপর্ব্বতের গুহায় আলোক মালায় মণ্ডিত হইয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং হজরতের নিকট একখানা লিপি প্রদান করিয়া বলিলেন—'পাঠ কর'। হজরত বলিলেন

"আমি নিরক্ষর"। তিনবার এই অনুরোধ বা আদেশ তাঁহার প্রতি করা হইল। অবশেষে গ্রেবিয়েল নিজে লিপি পাঠ করিলেন এবং মহম্মদ তাহা আবৃত্তি করিলেন। গ্রেবিয়েল হজরতকে আল্লার বাণী প্রচার করার জন্য আদেশ করিলেন। এইরূপে ভগবানের প্রকাশ দেখিয়া হজরত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। পরে কোনো প্রকারে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রণয়িণী খাদিজার নিকট এই শুভবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। খাদিজা আনন্দিত হইয়া পণ্ডিত প্রবর ওয়ারাকাকে এই সংবাদ দিলেন। ওয়ারাকা যদিও খৃষ্টান ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি সংসারে ধর্ম্মের গ্লানি দেখিয়া ইহুদি ধর্ম্মের বিশ্বাস অনুযায়ী একজন লোক শিক্ষকের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন এবং খাদিজাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন, কেননা, তাঁহার বিশ্বাস হইল যে তাঁহার স্বামীই সেই লোকোত্তর প্রেরিত পুরুষ।

২। ধনী দরিদ্র সকলের প্রতি সমব্যবহারের দৃষ্টান্ত— একদা হজরত মক্কার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনায় নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময় একটী অন্ধলোক তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করার জন্য তাঁহার নিকটে আবেদন জ্ঞাপন করিল। হজরত এই আবেদন শুনিয়া, প্রধানগণের শিক্ষাকার্য্যে একটু বাধাপ্রাপ্ত হইলেন এবং তজ্জন্য বিরক্তি বোধ করিয়া অন্ধলোকটীকে কটু জবাব দিলেন, তাহাতে সেই

লোকটী দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেল। তাহার চলিয়া যাওয়ার পর, হজরত অনুতপ্ত বোধ করিলেন, কেননা আগ্রহান্বিত এই অন্ধ হয়ত তাঁহার উপদেশে বিশ্বাস চক্ষু লাভ করিয়া অন্য বিশ্বাসিগণের পথ প্রদর্শক হইতে পারিত। তদবধি তিনি সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলেন। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি ক্রীতদাস সকলেই তাঁহার নিকট তুল্যমূল্য হইয়া দাঁড়াইল।

এই ব্যবহারে যখন ক্রীতদাসগণ হজরতের ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিল, তখন তাঁহাদের প্রভুগণ মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেন। হজরতকে একদিন আবুজহল নামক একজন অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক তজ্জন্য অকথ্য ভাষায় গালি দিলেন। হজরত একেবারে নির্ব্বাক হইয়া এই অপমান সহ্য করিলেন। একটী দাসী হজরতের খুল্লতাত হামজাকে এই অপমানের বিষয় বলিয়া দিল। হাম্‌জা তখন শিকার হইতে ফিরিতেছিলেন; তিনি শুনিবামাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া যে স্থানে আবুজহল বসিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে তরবারির দ্বারা মুখে আঘাত করিয়া বলিলেন, "আমিও মহম্মদের মতাবলম্বী। তোমার সাধ্য থাকে ত আমাকে বাধা দান কর।" আবুজহলের দলের অনেক লোক তথায় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও আবুজহল কোনো বিবাদের সূচনা করিলেন না। তিনি স্বীয় ভুল বুঝিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন।

৩। দরিদ্রের প্রতি হজরতের বিশেষ নজর ছিল—তিনি

রমজানের শেষে একদিন দরিদ্রনারায়ণের সেবা যথেষ্ট মনে করিতেন না। সুতরাং নিয়ম করিয়া দিলেন, সম্পত্তির এক চত্বারিংশ ভাগ দরিদ্রের জন্য দান করিতে হইবে। ইহাকে জাকত বলে। সকল প্রকারের সম্পত্তির এই অংশ দেয়। কি ভাবে দান করিতে হইবে তদ্বিষয়ে বিশেষ নির্দ্দেশ তিনি দিয়াছেন। তিরস্কার বা ভৎ´সনাপূর্ব্বক দান করিবে না। লোককে দেখাবার জন্য দান করিবে না। ভগবৎ-প্রীতি লাভের জন্য দান করিবে। "দরিদ্রান্ ভরকৌন্তেয়"—এই সত্য হজরতও শিক্ষা দিয়াছেন। দরিদ্র ও নিঃস্বকেই দান দিতে হইবে।

৪। পানাসক্তি সম্বন্ধে তাঁহার একান্ত নিষেধ রহিয়াছে। কোরাণের একটিমাত্র মন্ত্রে এই নিষেধ লিখিত রহিয়াছে।

৫। ঘোড়া সম্বন্ধে হজরতের মত :—আরবেরা উষ্ট্র ব্যবহারে নিপুণ ছিল না। তাহারা ঘোড়ার তেমন আদর করিত না। কিন্তু যুদ্ধে ঘোটক-সোয়ার হইলে সুবিধা হয়, বুঝিতে পারিয়া হজরত একটি কোরাণের মন্ত্রে এই বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি আরবদিগকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করার জন্য ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা করেন। ইহাতে আরোহী ও পালক-গণের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব বর্দ্ধিত হওয়াতে ভবিষ্যতে মহদুপকার সাধিত হয়। এখন আমরা যে আরবদেশীয় ঘোটকের প্রশংসা করি, সেই উৎকৃষ্ট ঘোটক হজরতের উপদেশ ও যত্নের ফল বলিতে হইবে।

৬। **হজরত মহম্মদের ক্ষমাশীলতা** ঃ—একদিন জৈনাব নাম্নী এক ইহুদী-রমণী হজরতকে একটী পক্ক মেষ উপহার দিল। হজরত সান্ধ্য-নামাজের পর বন্ধুগণ সহ আহারে বসিলেন। মেষমাংস সুপক্ক বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু তিনি একখণ্ড মাংস মুখে দিয়া চর্ব্বণ করিয়া তিক্ত বোধ করিলেন এবং ইহা বিষাক্ত বলিয়া ফেলিয়া দিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার জনৈক বন্ধু এক টুকরা খাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি ত অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। হজরত তখন সেই স্ত্রীলোকটীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করিল এবং বলিল যে যুদ্ধে তাহার পিতা, খুল্লতাত প্রভৃতি অনেকে নিহত হইয়াছেন। তাই সে প্রতিশোধ লইল এবং বলিল যে তিনি ত ভগবানের প্রেরিত পুরুষ, ভগবান তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। তাই সে ভগবানের প্রেরিত পুরুষের প্রতি তাঁহার কৃপা পরীক্ষা করিল। হজরত তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন, কিন্তু মৃতবন্ধুর আত্মীয়গণ ইহুদী-রমণীকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিল।

শারীরিক শ্রম বিষয়ে একটী উপাখ্যান

একদিন একজন নিঃস্ব লোক হজরতের নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিল। হজরত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার গৃহে কোনো আসবাব আছে কি না। সেই ব্যক্তি বলিল যে তাহার গৃহে একখানা শতরঞ্চ ও একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্র

আছে। শতরঞ্চখানার অর্দ্ধেক সে নীচে দিয়া শয়ন করে এবং বাকী অর্দ্ধেক দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করে ; এবং কাষ্ঠের পাত্র দিয়া জল পান করে। হজরত তাহাকে সেই শতরঞ্চ-খানা ও পেয়ালাটী লইয়া যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। সে তাহা আনিয়া উপস্থিত করিল। হজরত তখন সমবেত অন্য লোকদিগের নিকট এই দুইটি দ্রব্য নিলামে বিক্রয় করিলেন। ইহাতে দুই টাকা পাওয়া গেল। এই টাকার অধিকাংশ দ্বারা পরিবারবর্গের খাদ্য ক্রয় করিতে তিনি তাহাকে বলিলেন ও পেয়ালার মূল্য দ্বারা একখানা দা ক্রয় করিয়া অরণ্যে যাইয়া জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে বলিলেন। লোকটী তাহার মহদুদ্দেশ্য বুঝিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করিতে লাগিল এবং হজরতের নির্দ্দেশ মত কিছুকাল পরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল যে সে পনরো দিনে দশটী রৌপ্যমুদ্রা অর্জ্জন করিয়াছে এবং ইহা দ্বারা সে পরিবারের আহার্য্য ও পরিধেয় বস্ত্র ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। তখন হজরত তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে এইরূপ শ্রম করিয়া নিজের অভাব মোচন করা ভিক্ষাবৃত্তি অপেক্ষা অনেক উত্তম পন্থা। এইরূপ পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিলে শেষ বিচারের দিনে তাহাকে লজ্জিত হইতে হইবে না।